মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র



জিতেন্দ্রলাল বসু এম-এ, বি-এল
প্রণীত



শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

মূল্য ১৷৷০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—
মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।
বরেন্দ্র লাইব্রেরী।
ডি, এম, লাইব্রেরী।
মিত্র ব্রাদার্স—
ঘোষ লাইব্রেরী, ১ নং সিমলা লেন, কলিকাতা
ও বারুইপুর বাজার, চব্বিশপরগণা।

১ম সংস্করণ।

৬৮নং শিবনারায়ণদাসের লেন
ঘোষ প্রেসে
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

প্রকাশকের নিবেদন।

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের অপার করুণায় "মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র" এতদিনে প্রকাশিত হইল। সাহিত্য সম্রাট অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ে "মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কয়েক স্থলে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রবন্ধগুলি এখন গ্রন্থরূপে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইল।

প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যে গ্রন্থকারের এই প্রথম দান। গ্রন্থকার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনীভাষায় "মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র" বিস্তৃত সমালোচনা দ্বারা দেশবাসীকে প্রাচীনের পক্ষপাতী করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নিরপেক্ষভাবে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের চিত্রিত চরিত্র সমূহের বিশদ বিশ্লেষণ বোধ হয় এই প্রথম।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চেন্সেলার স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় বঙ্গ-বাণীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালা ভাষাকে যখন এম এ পরীক্ষার্থীর পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করেন তখন গ্রন্থকারের নিকট

এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি সানন্দচিত্তে উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের ভারার্পণ করেন ১৩২৮ বঙ্গাব্দে উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ করি। অযোগ্য হস্তে প্রকাশের ভারার্পণ করিয়া গ্রন্থকার পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়া দিবার কিছুদিন পরে, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হন। সেই কালব্যাধির কবলে সুদীর্ঘ দুই বৎসর নানা যন্ত্রণা ও অশান্তি সহ্য করিয়া তাঁহার বড় আদরের—বড় সাধের গ্রন্থখানির মুদ্রণ কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন। গ্রন্থকারের অমর আত্মা অমর ধামে বসিয়া এই দীন অযোগ্য প্রকাশকের সকল অপরাধ ক্ষমা করেন ইহাই প্রার্থনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষক, রবিয়ানার লেখক প্রবাহিনী, নায়ক, ও বাঙ্গালীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নির্ভীক সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থের ভূমিকা সম্পাদন করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। বারুইপুর ঘোষ লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জানকী নাথ ঘোষ মহাশয় পুস্তকখানির অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পাদন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য অনুগ্রহপূর্ব্বক করিয়াছেন। সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

না বুঝিয়া ক্ষুদ্রশক্তি প্রকাশক এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। তাই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ত্রুটী রহিয়া গেল। যে সকল ভ্রম প্রমাদ বা বিশৃঙ্খলা গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে, তাহা, গ্রন্থ-

কারের নহে, প্রকাশকের। প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী সাহিত্যামোদী সুধীবৃন্দ কৃপা করিয়া অযোগ্য প্রকাশকের এই অজ্ঞানকৃত ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমার চক্ষে দেখিলে কৃতার্থ হইব। ইতি

মজিলপুর, ২৪ পরগণা।
১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখী—সংক্রান্তি।

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।
প্রকাশক।

ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ব্বে সমালোচনা বলিয়া কোনও জিনিষ ছিল না। ইংরাজ-আমলে ইহার আমদানী হইয়াছে, এবং ইংরাজী সমালোচন সাহিত্য পড়িয়াই আমরা ইহা লিখিতে শিখিয়াছি। যতটুকু জানি, তাহাতে মনে হয়, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'ই ইহার উন্মেষ দেখা যায়, পরে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে' ইহা বিশেষরূপে বিকাশ লাভ করে। আলু ও পেঁপের বীজের মত ইহার বীজও বিদেশ হইতে আমদানী হইলেও এ দেশের মাটিতে ইহা বেশ লাগিয়া গিয়াছে। কোনও কোনও মনীষী এ জিনিষটাকে তেমন সু নজরে না দেখিলেও আমরা ইহার পরম পক্ষপাতী। সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করি। সাহিত্য-সংসারে ইহা একদিকে প্রহরী ও অন্য দিকে পুরোহিতের কার্য্য করে।

তবে এটুকুও এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের দেশের অনেক লেখকই পাশ্চাত্য লেখকগণের তথ্য ও তর্কযুক্তিকে সমালোচনার সার্ব্বভৌমিক মাপকাটি মনে করিয়া তাহারই পরিমাপে বাঙ্গালা গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করিতে বসেন। কিন্তু এরূপ বিচারকে কখনই সুবিচার বলিতে পারা যায় না দেশের রুচি, রীতি ও সভ্যতার আদর্শ ভেদে বিচা-

রেরও ভেদ হইয়া থাকে। এই বিচার-ভেদের জ্ঞানকেই আমরা স্বাধীন চিন্তা বলি। এ বিচার-ভেদ-জ্ঞান যাহার আছে, তিনিই সুবিচার করিতে পারেন, তিনিই সমালোচনা করিবার অধিকারী—তাঁহারই সমালোচনা সত্য হয়। নহিলে, মুখস্থ বিদ্যার বিবৃতির সহিত যাহা মিলে তাহার প্রশংসা করিলে, এবং যাহা মিলে না, তাহার নিন্দা করিলে প্রকৃত বিচার বা সমালোচনা হয় না। ফলে, ভাল ... অনেক সময় মন্দ, এবং মন্দকে অনেক সময় ভাল বলিতে ... বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের লেখক স্বর্গীয় জিতেন্দ্রবাবু ... শ্রেণীর সমালোচক ছিলেন না। বিলাতী সমালোচনার চশম... রিয়া তিনি দেশীয় গ্রন্থের গুণাগুণ দেখিবার চেষ্টা করিতেন ...। তিনি জানিতেন যে, হিন্দুর মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম, এবং সেই ...কে আশ্রয় করিয়া তিনি স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে দেশীয় গ্র... ভাব, ভাষা, রুচি, রস, মৌলিকতা সহৃদয়তা এবং ভাব-উ... ...র উপকারিতা ও অপকারিতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের বি... করিতেন। এইজন্য তাঁহার লেখা আমার বড়ই ভাল লা...। তিনি যখন যে কাগজে লিখিতেন ...নিতাম, তখনই ... কাগজ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার লেখা সাগ্রহে পড়িতাম। ...হার 'কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র' যখন নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শ... প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন আমার পূজনীয় সুহৃ... ...ীয় সমাজপতি মহাশয়ের মুখে ঐ লেখার বিশেষ সুখ্যাতি ... ...া উহা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই।—পাঠ করিয়া লেখ... ...চার-বিশ্লেষণের শক্তি-দর্শনে

বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই লেখা যে আজ মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, এজন্য আমি আনন্দিত। আমার পক্ষে আরও আনন্দের কথা এই যে, সেই লেখারই ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে।

ভূমিকা কি? ভূমিকা পুস্তকের প্রবেশ-দ্বার-স্বরূপ। ইহার উদ্দেশ্য পুস্তকের সহিত পাঠকের পরিচয়-সাধন করাইয়া দেওয়া। সংস্কৃত নাটকের যেমন প্রস্তাবনা—অন্যান্য পুস্তকের পক্ষে ভূমিকা জিনিষটাও অনেকটা সেই রকম। উভয়েরই কাজ গ্রন্থের গোড়া ধরাইয়া দেওয়া—আভাসে-ইঙ্গিতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য, অনর্থক বাগাড়ম্বরের দ্বারা ভূমিকাকে ভারাক্রান্ত না করিয়া এই হিসাবেই আমি আমার বক্তব্যটুকু বুঝাইয়া বলিবার এখানে চেষ্টা করিব।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনামূলক সমালোচনা এই গ্রন্থে যে ভাবে করা হইয়াছে, সে ভাবে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ কখনও যে করিবার চেষ্টা করেন নাই, এমন কথা অবশ্য বলি না। ১৩০১ সালের মাঘ মাসের সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকায় স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"বাল্যকালে শুনিলাম, ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। শুনিতাম, বাঙ্গালা ভাষায় ভারতের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব আর হয় নাই, তাঁহার ন্যায় মৌলিকত

অন্য কোন কবির নাই, তাঁহার ন্যায় মধুরত্ব ও লালিত্যও অন্য কবির নাই।"

"এখনও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশের প্রধান কবি মনে করেন। মাননীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ কবি এখনও বঙ্গদেশে হয় নাই। অন্যান্য বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকের মত এই যে, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ গুণাকর ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন; আধুনিক কবি মধুস্থদন দত্তও ভারতের নিকটে স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না।"

"আমরা অদ্য এ বিষয়ে কোনও সমালোচনা করিব না ভারতচন্দ্র কি দরের কবি, তাহার নিষ্পত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের মৌলিকতার প্রশংসা করেন, তাঁহারা একবার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কবিতা পড়িবেন, এইটী আমাদের প্রার্থনা। গুণাকর পত্রে পত্রে কবিকঙ্কনের নিকট ঋণী, কবিকঙ্কনের কবিত্ব পত্রে পত্রে নকল করিয়াছেন, কবিকঙ্কনের স্বাভাবিক ও সুন্দর বর্ণনাগুলি অলঙ্কার দিয়া কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। কবিকঙ্কনের কাব্য সরল, স্বাভাবিক ও সুপাঠ্য; গুণাকরের কাব্য অধিকতর সুললিত, কিন্তু অস্বাভাবিক এবং অনেকস্থানে অপাঠ্য।" রমেশচন্দ্র যাহা অতি সংক্ষেপে, অতি অল্প প্রমাণ প্রয়োগে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জিতেন্দ্রলাল তাহাই সবিস্তারে বহু

তর্ক-যুক্তির সমাবেশে সহজ বোধ্য ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের এই লেখার সহিত জিতেন্দ্রলালের হয়ত পরিচয় ছিল না, কিন্তু উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয় যে প্রধানতঃ এক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সূক্ষ্মদর্শন ও অপূর্ব্ব বিশ্লেষণের পরিচয় যে জিতেন্দ্রলালের এই লেখার সর্ব্বত্র পাওয়া যায়, সে কথা এ গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। সাধক রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া গ্রন্থে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাও যথেষ্ট চিন্তা-শালতার পরিচায়ক। এ ভাবে এমন বিস্তারিত আলোচনা যে ইতিপূর্ব্বে কেহ করেন নাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের পাঠ্য হইয়াছে। এম-এ ক্লাসের ছাত্রেরা এই পুস্তক পাঠ করিলে যে উপকৃত হইবেন, এবং অনেক নূতন কথা শিখিবেন, এমন আশা আমরা করি।

২৬শে চৈত্র, ১৩৩০
কলিকাতা।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বাভাস।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবিসম্বাদ বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন, এবং কথিত আছে যে রাজা রামমোহন রায় একবার কাব্যপ্রণয়নে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত লিখিতে পারিবেন না বুঝিয়া, সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এতৎসত্ত্বেও ইহা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে মুকুন্দরাম আজকাল শিক্ষিত সমাজে উপেক্ষিত, এবং ভারতচন্দ্র অত্যন্ত অবজ্ঞাত। ভারতচন্দ্রকে অবজ্ঞা করিবার যে কারণ সাধারণতঃ নির্দ্দেশিত হয়, তাহা অনেক পরিমাণে ন্যায্য; কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকে অবহেলা করিবার কোনও ন্যায্য কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কারণ থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু তিনি যে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে পরিচিত নহেন, একথা নিশ্চিত সত্য।

কেন এমন হয়, যে কবিদ্বয়ের গীত এককালে সাধারণের এত প্রিয় ছিল, এখন তাঁহারা কেন অনাদৃত, এবিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এখন যে জীবসমষ্টি বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত, তাহারা ঠিক বাঙ্গালী নহে, আমরা এখন আমরা নহি, আমাদের সঙ্গে বিদেশীয় ভাবের এতটা মাখামাখি হইয়া গিয়াছে যে এখন কোনও বিষয়েই খাঁটি বাঙ্গালা জিনিষ আমাদের মনোমত হয় না। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে "এখন আর খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না হইয়াও কাজ নাই"। "খাঁটি বাঙ্গালা কাব্য হয় না" সেটা সত্য, কিন্তু "হইয়াও কাজ নাই" একথা এখন আবার সকলে নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কিনা জানি না। মুকুন্দরামের "চণ্ডী"কে আমরা খাঁটি বাঙ্গালার কাব্য বলিতে পারি। এমন একখানি কাব্য আজ-কাল যদি হয়, তাহা যে আদৃত কেন হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না। কাব্য সম্বন্ধে আমরা যে একটা ধারণা গড়িয়া লইয়াছি, সেই ধারণার পোষাক না হইলেই সেই কাব্যকে আমরা নিস্পৃহ চক্ষে দেখিয়া থাকি। আজকালকার কাব্য-নিচয় সেই ধারণাপ্রসূত বলিয়া আমাদের কাছে, অর্থাৎ মুষ্টি-মেয়ের কাছে আদৃত। আগেকার কাব্যগুলি সাধারণের জন্য, আজকালকার কাব্যগুলি বিদেশীভাবাপন্নের জন্য লিখিত। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সাধারণ বাঙ্গালী আজকালকার কাব্য

পড়ে না, আর ইংরাজী ভাবাপন্ন বাঙ্গালী আগেকার কাব্যগুলি পড়ে না। কিন্তু কোনও ক্ষমতাপন্ন কবি যদি বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত ভাব বুঝিয়া বাঙ্গালীর কাব্য লেখেন, তাহা হইলে সে কাব্য "হওয়া কাজ নাই" বা তাহার অনাদর হওয়াই আবশ্যক, একথা আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

একদিন আমরা হঠাৎ লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম যে "ইংরাজী পুস্তকাগারের একটী সেল্‌ফে যে পুস্তক থাকিতে পারে, তাহাই এসিয়ার সমস্ত পুস্তকাগারের সমস্ত পুস্তকরাশির অপেক্ষা মূল্যবান্।" এই শিক্ষা আমাদিগকে বহুদিন দৃষ্টিহীন করিয়া রাখিয়াছিল; বহুদিন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, যাহা ইউরোপীয়ভাবে ওতঃপ্রোত নয় তাহা ভাল জিনিষ হইতে পারে না, তা সাহিত্যেই হউক বা অন্য কিছুতেই হউক। নূতনত্বের মদিরাকর্ষণে আমরা অনেক দিন মত্তাবস্থায় কাটাইয়াছি, সে নেশা যে এখনও কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না; তবে নেশা কাটাইবার প্রয়াস হইতেছে, এবং তাহারও ফল যেন একটু একটু দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের স্বাতন্ত্র্য কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালিত্বের গৌরব অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাঙ্গালী আবার নিজের দোষ গুণ খুঁজিয়া লইয়া বাঙ্গালীজীবন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে; বাঙ্গালী বুঝিতে শিখিয়েছে যে, ভারতবর্ষের জল হাওয়ায় যে শরীর গঠিত, ভারতবর্ষের তপোভূমিতে যেমন যুগযুগান্তর ধরিয়া পরিপুষ্ট, তাহা বিদেশীয় আদর্শে

গঠিত বা পুষ্ট করিবার অভিলাষ অত্যন্ত অসমীচীন। তাই বলিতেছিলাম,এখন যদি কোনও ক্ষমতাশালী কবি কবিকঙ্কণের আদর্শে কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালীর সমক্ষে আনায়ন করেন, তাহা হইলে এমন কাব্য হইয়া কাজ নাই,এমন কথা কি আমরা বলিতে পারি ?

কিন্তু তাহার এখনও বড় বিলম্ব আছে। যে চেষ্টার কথা বলিয়াছি, তাহা জনকতক সূক্ষ্মদর্শিগণের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে, সাধারণ্যে প্রসৃত হয় নাই। এখনও অনেক শিক্ষিত-নামধেয় বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালার পূর্ব্ব কবিগণের নাম পর্য্যন্ত অবগত আছেন কিনা সন্দেহ। অনেকের এখনও বদ্ধমূল ধারণা আছে যে বাঙ্গালায় মাইকেলের পূর্ব্বে সাহিত্য ছিল না; বাঙ্গালার পূর্ব্বকবিগণ অপাঠ্য। ইহার একটী কারণ অবিসম্বাদে এই নির্দ্দেশ করা যায় তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাটা এমন পরিপাটীভাবে ভুলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব বঙ্গকবিগণের কাব্য বুঝিতে হইলে তাঁহাদের মাথার ঘাম পায়ে পড়িবার সম্ভাবনা; কাজেই তাঁহারা নিজ অলস বিলাসী জীবনটাকে এই দুরূহ শ্রম স্বীকার করাইতে নিতান্ত নারাজ। দ্বিতীয় কারণ—সেই ধারণা যে কাব্য এমন একটা জমকালো জিনিষ হওয়া চাই যাহাতে সাধাসিধে ঘরোয়া কথা কিছু থাকিবে না, সোজাসুজি নিত্যদৃষ্ট ঘটনা বা নিত্য-প্রযুক্ত ভাষা তাহাতে কিছুই থাকিবে না। তাহা যদি কোনও কাব্যে থাকিল তবেই সে কাব্য অপাঠ্য। আমরা একটা নূতন কথার মোহে এখনও বিশেষরূপে আবিষ্ট রহিয়াছি, সেটা

"Sublime"। কাব্য sublime হওয়া প্রয়োজন এই বিশ্বাস আমাদের খুব, কিন্তু sublime জিনিষটা কি তাহা যে ঠিক বুঝিতে পারি বা বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা বোধ হয় না। কাব্যের ভাষা সম্বন্ধেও আমরা এমনই একটা কথার মোহে আবদ্ধ; সে কথাটা "Sonorous. আমাদের পূর্ব্ব কবিগণ যে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাহা নহে, বরং তাঁহারা ভাবিতেন যে যেথানে সেখানে ভাষা খুব বিশুদ্ধ হওয়ার আবশ্যক করে না, ফলতঃ ভাষা সম্বন্ধে কোনও একটা অপরিহার্য্য নিয়ম তাঁহারা মানিতেন না। ইহাও বোধ হয় তাঁহারা স্বীকার করিতেন না যে, যাহা নিত্য সংঘটিত ঘটনা তাহাতে উচ্চতা (sublimity) আসিতে পারে না। কাজেই তাঁহাদের কাব্যে এমন ঘটনা অনেক আছে। কাব্যের উচ্চতা প্রদান কবির ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তাহা কোন্ কবি কতদূর করিতে পারিয়াছেন, তাহা কব্যে সমালোচনা দ্বারা স্থির করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও অনেক পরিমাণে নেশার ঘোরে রহিয়াছি, তাই সে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত হই না। যাঁহারা তাহা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে পূর্ব্বকালের বঙ্গকাব্য বহুমুল্য সম্পদে সম্পন্ন। সে সম্পদ অবহেলার বা অবমাননার উপযোগী নহে। সুখের বিষয় যে আমরা এই কথাটা আবার বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি—অন্ততঃ এটুকু বুঝিতেছি যে বাঙ্গালা ভাষার আদি কবিগণকে তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহাদিগকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ

বৈ লোকসান নাই। তাঁহাদিগের চর্চ্চা করিলে অন্ততঃ বাঙ্গালীর পূর্ব্বাবস্থাও বেশ জানিতে পারা যাইবে। এরূপ স্থলে পূর্ব্ব বঙ্গকবিগণের কাব্যসমালোচনায় কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না ভাবিয়া আমি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনায় সমালোচনা এ কথা শুনিলে আপাততঃ একটু মনে খটকা লাগিতে পারে বটে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, মুকুন্দরামও ভারতচন্দ্রে কি সাম্য আছে যে তাঁহাদের তুলনা হইতে পারে? তুলনায় সমালোচনা অর্থে দুই কবিকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখা, তা তাহাতে সাম্যই দেখা যাউক আর বৈষম্যই দেখা যাউক। এই হিসাবেই আমি তুলনায় সমালোচনা কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার ফলাফল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে, কিন্তু এ কার্য্য যে নিতান্ত নিষ্ফল নহে, তাহাই বলিবার ইচ্ছা আছে। আর কিছু ফল না পাওয়া যাইলেও অন্ততঃ এইটুকু বেশ বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। দুই কালের মানুষের মূর্ত্তি দুই কালের দুই কবির কাব্যদ্বয় হইতে বেশ চিনিতে পারা যইবে।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে যে সাম্য আছে তাহা অনেকটা বিষয়গত। রবির উজ্জ্বল কিরণ আর চাঁদের মৃদু চন্দ্রিকায় যে সাম্য আছে, ইহাও সেইরূপ। দুইই এক বস্তু, একটী অপরের প্রতিবিম্ব মাত্র। চাঁদের আলো মিষ্ট ও সুদৃশ্য, কিন্তু তাহাতে

জগৎ উদ্ভাসিত হয় না, তাহার জন্য সূর্য্যের রশ্মির প্রয়োজন হয়। মুকুন্দরামের কাব্য সূর্য্যালোক ভারতচন্দ্রের কাব্য চন্দ্র-রশ্মি। ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে যাহা পাইয়াছিলেন, অনেক স্থলে তাহাই নিজ কাব্যে আনয়ন করিয়াছেন,কিন্তু মুকুন্দরামে যাহা উজ্জল ও সুস্পষ্ট,ভারতচন্দ্রে তাহাই স্তিমিত ও কৃত্রিম। উভয় কবির তুলনাস্থল তাঁহাদের সাংসারিক জ্ঞান। কিন্তু এই সাংসারিক জ্ঞান প্রকাশ করিবার কৌশল দুই কবিতে বিভিন্ন। দুই কবিই আমাদের ঘরের কথা অনেক পরিমাণে নিজ কাব্য-বিষয়ীভূত করিয়াছেন, কিন্তু যেমন সূর্য্যালোকে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়া সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা যায়, আর চন্দ্রালোকে লোকের মনে একটু সুখের আবেশ আসিলেও তাহা দ্বারা জগতের অন্য কোনও কার্য্য হয় না, সেইরূপ মুকুন্দরাম নিজ সহৃদয়তাও রসাবতারণ শক্তির সাহায্যে তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান ও মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা অপূর্ব্ব কৌশলে আমাদের হৃদয়ে ও মর্ম্মে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি উন্মূক্ত করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতের সমস্তটুকু পরিষ্কাররূপে দেখিতে ও বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান বা মনুষ্য হৃদয়জ্ঞতা লইয়া যেন খেলা করিয়াছেন, কোথাও তাহা তাঁহার চন্দ্ররশ্মিস্পর্শে অর্দ্ধপ্রকাশিত হইয়া ঝিকিমিকি করিতেছে, কোথাও বা শুধু আভাসমাত্র দেখা যাইতেছে; চন্দ্রালোকে মানুষ চেনা বড় কঠিন, শুধু একটা মানুষ আছে এইটুকুই বোঝা যায়। ভারতচন্দ্রও যে মানুষ বুঝিতেন তাহা

নিশ্চয়, কিন্তু বোঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। মনুষ্যের সুখ দুঃখ লইয়া, মনুষ্যের মন লইয়া ভারতচন্দ্র সোহাগই করিয়াছেন, তাহার সমগ্রতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই; চাঁদের আলোতে মানুষ সোহাগই করিতে ভালবাসে। এই প্রকার বিভিন্নতা থাকিলেও বলিতে হইবে যে কবিদ্বয়ের ভিতর কথঞ্চিৎ ঐক্য আছে।

ঐক্য শুধু ভাবে নহে, বিষয়েও। অতএব একথা নিঃসংশয় বলা যায় যে ভারতচন্দ্র অনেকস্থলে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন। একজন সৃষ্টি করিয়াছেন আর একজন নকল করিয়াছেন। অনুকরণের যে দোষ তাহা ভারতচন্দ্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে। অনুকৃত বস্তুকে কথা সাজাইয়া লুকাইবার চেষ্টা ভারতচন্দ্রে সর্ব্বদা জাগরূক। ফল হইয়াছে এই যে, কৃষ্ণনগরের কারিগর এমন একটি মৃণ্ময় আম্র গড়িয়াছেন যে তাহা দূর হইতে দেখিলে তাহাতে আম্রভ্রম অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে যাও, রসের বদলে মাটীতে মুখ পূরিয়া যাইবে। ভ্রান্তি দূর হইলেও কিন্তু বিস্ময় ঘুচে না, লোকে তখনও বলিতে বাধ্য হয় কি নিপুণ কারিগরি!

একটা বিষয় লইয়া এই কথাটা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাউক। কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" কাব্যে ও ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" হরগৌরীর কথা আছে সকলেই জানেন। বিষয়টি দুই কাব্যে প্রায়ই এক রকম। এই হরগৌরীর কথার ব্যপদেশে বাঙ্গালীর ঘরের যে কথাটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই এখন

আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে। এই ঘরের কথাটুকুর বর্ণনা রবিবাবুর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় জানান ভাল। "তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাঙ্গালা দেশের একটা বড় মর্ম্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার, কন্যাদায়ের মত দায় নাই। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্ত্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্ম্মবেদনা সর্ব্বদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে। একান্ন পরিবারে আমরা দূর ও নিকট এমন কি নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই, কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী স্ত্রী ব্যতীত পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্ম্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্ব্বদাই সেই ক্ষত-বেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাঙ্গালার একান্ন পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎ-সপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারী বধু কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারী ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই সকল কারণে হরগৌরীর সম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব

ভাবের। তাহা রচয়িতার ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে, তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত।”

হরগৌরীর কথা সম্পূর্ণরূপে দুই কাব্যের কোনও কাব্যেই নাই, তবে যতটুকু আছে তাহাতেই একটা গৃহচিত্র আবরণমুক্ত হইয়া আমাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই গৃহচিত্রাঙ্কণে দুই কবির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য আছে। বিষয় প্রায়ই এক. দক্ষযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, শিব-পার্ব্বতীয় কলহ পর্যান্ত দুই কাব্যেই অঙ্কিত ও বর্ণিত হইয়াছে। দুই কাব্যেই দারিদ্র্য নিবন্ধন শ্বশুরের কাছে জামাতার অপমান, স্ত্রীর পতিনিন্দাশ্রবণে দেহত্যাগ, পতির স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, আবার পতিপত্নী সংযোগ ও শেষে দ্যরিদ্র্যদোষে পতিপত্নীর কলহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। হরগৌরীর কথার ব্যপদেশে লিখিত হইলেও ইহা যে আমাদের ঘরের কথা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সকল চিত্র আঁকিবার সময় দুই কবিই হরগৌরীর দেবত্ব বিস্মৃত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুকুন্দরাম আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া সেই চিত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ভারতচন্দ্র ভুলিতে পারেন নাই যে শ্রীভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবিতা লিখিতেছেন। মুকুন্দরাম দক্ষের মুখে শিব নিন্দা প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ভারতচন্দ্র নিন্দাচ্ছলে স্তুতি লিখিতে গিয়া কথা সাজাইয়া-

ছেন, তাহাতে ধনী শ্বশুরের দরিদ্র জামাতার প্রতি শ্লেষ একেবারেই ব্যক্ত হয় নাই। মেনকার মুখে মুকুন্দরাম স্বামীর সহিত নিজগৃহে অবস্থিতা কন্যার প্রতি যে কথাগুলি বসাইয়াছেন এবং উচ্ছ্বাসে উমার কার্য্য বঙ্গগৃহের একটা দারুণ চিত্র প্রকাশ করিয়াছে; ভারতচন্দ্র সে চিত্র মোটেই আঁকেন নাই। মুকুন্দরামের চিত্রগুলি আমাদের নয়নের সমক্ষে দারিদ্রের একটি সম্পূর্ণছবি আঁকিয়া তোলে, ভারতচন্দ্রের চিত্রগুলি দারিদ্রের চিত্র হইলেও তাহা অসম্পুর্ণ ও অনেকস্থলে অসংলগ্নও বটে। (ভারতচন্দ্র একবার গৌরীদ্বারা "মোলানীভার" পূরণ করাইতেছেন আবার পরক্ষণেই দারিদ্রের জন্য হরগৌরীর কোন্দল বাধাইতেছেন। মুকুন্দরামের দরিদ্র-গৃহ হঠাৎ সম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে নাই; তিনি অকাতরে গৌরীদ্বারা শিবকে ত্রিশূল বাঁধা দিবার পরামর্শ দেওয়াইয়াছেন। ইহাতে লোকের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মহাদেব যেন একটু গায়ে পড়িয়া কোন্দল উপস্থিত করিয়াছেন। মুকুন্দরামের গৌরী শিবের মুখের সম্মুখে "আমি অত্মঘাতা হব" ভিন্ন আর কিছু বলেন নাই, ভারতচন্দ্রের গৌরী খুব একপালা মহাদেবকে শুনাইয়া দিয়াছেন।) মুকুন্দরামের গৌরী খেদ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের গৌরী ঝগড়া করিয়াছেন। মুকুন্দরামের কবিতার ন্যায় তাঁহার গৌরীও দরিদ্রা, কিন্তু হৃদয়হীনা নহেন, বরং স্নিগ্ধা। ভারতচন্দ্রের গৌরী তাঁহার কবিতারই মত সখ করিয়া মুখরা, যিনি এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শূন্য ভাণ্ডার খাদ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়া

ছিলেন, তৎ পরক্ষণেই অন্নপূর্ণা হইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার সথ করিয়া বাক্‌যন্ত্রণা দিয়া স্বামীকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু সে যাহাই হউক একথা চরিত্র-চিত্রের অন্তর্গত; অতএব ঐ বিষয়ের বিচার করিয়া একথা বিশেষ ভাবে বলিবার অবসর হইবে।

তাই বলিতেছিলাম যে এই হরগৌরীর চিত্রে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের অনেকটা সাম্য আছে। কিন্তু সাম্যও যেমন আছে তেমনি এই সকল চিত্রেই দুই কবির মধ্যে যে বৈষম্য তাহাও বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিকঙ্কণের চিত্র একটী সমগ্র দৈন্যের গৃহচিত্র, ভারতচন্দ্রের চিত্র সমগ্র নহে, খণ্ড চিত্র মাত্র। কিন্তু কেবল এইটুকুতেই সে বৈষম্য প্রকাশিত হয় নাই। আর একটী বিষয়ে তাহা বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে। সে বিষয়টি গৌরীর বিবাহের পূর্ব্বের চিত্রগুলি। এইগুলি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে মৌলিক পার্থক্য কোথায়। মুকুন্দরাম আত্মসংযম, ভারতচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খলতা। ইহাই তাঁহাদের ভিতর যথার্থ পার্থক্য। মুকুন্দরাম দুঃখ, ভারতচন্দ্র সুখ; এ কথা বলিলে তাহাদের প্রকৃতিতে বিভিন্নতা ঠিক বুঝা যাইবে না। এই কথার পুনরুত্থাপন প্রয়োজন হইবে এই জন্য এখানে দুই কবির মধ্যে যে প্রভেদের বিষয় উল্লেখ করিলাম তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। এখন দেখা যাউক এই হরগৌরীর কথার ভিতর এই পর্থক্য কিরূপে বিকশিত হইয়াছে।

হিমালয়ের গৃহে সতী গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী উভয় কবিই তাঁহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বর্ণনাতেই উভয়ের শিল্প-কৌশলের পার্থক্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য উচ্ছৃঙ্খলতার লীলা-ক্ষেত্র নহে, তাহা একজন যেমন সুন্দরভাবে হৃদয়ে ধারণা করিয়াছেন, অপর একজন তেমনি তাহা ভুলিয়া গিয়া সুন্দর আদর্শ খর্ব্ব করিয়াছেন। দুইজনের সমক্ষেই একটি মহান্ বিরাট আদর্শ পড়িয়াছিল—কালিদাসের অমর সৃষ্টি কুমারসম্ভব। দুইজনই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; ইহাও দেখা যায় ভারত চন্দ্রের মনে সে সময় 'কুমারসম্ভবে'র কথা একটু উদিত হইয়াছিল, কতকগুলি বর্ণনা তিনি কুমারসম্ভব হইতে সংগ্রহও করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম শুধু কবি ছিলেন না তিনি সদ্বিবে-চক ও রসগ্রাহীও ছিলেন, তাই তিনি কালিদাসের কাছে ঋণ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই, গৌরীর শিবপূজা ব্রহ্মার পরামর্শ, দেবগণ কর্তৃক শিবের প্রতি অস্ত্রক্ষেপ, মদন ভস্ম, গৌরীর তপস্যা ও ছলনা ও পরে বিবাহ এই সকল ঘটনা তিনি কুমারসম্ভব হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ কাব্য মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মহাকবির বিরাট, অখণ্ডিত রস তিনি কোথাও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান নাই। ইহা দ্বারা তাঁহার কাব্য সৌভাগ্য কতদূর পুষ্ট হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। মহাযোগী যতক্ষণ গার্হস্থ্য অবলম্বন না করিয়াছেন,

ততক্ষণ তাঁহাকে গৃহস্থভাবে চিত্রিত করা, সামান্য মানবভাবে চিত্রিত করা আদৌ শোভন নহে, তাহা তিনি বুঝিতেন। সেই বিবেচনার ফলে আমরা বাঙ্গালায় কালিদাসের অতুলনীয় কাব্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। তাঁহার হাতে পড়িয়া একটি মহান্ আদর্শ দীর্ণ হইয়া যায় নাই। মুকুন্দরামের প্রতিভা সহজ বুদ্ধিশালিনী, তাই তিনি বুঝিতেন যে মহাকবি কালিদাস যে বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোন নূতনত্ব প্রদানের চেষ্টা করা, বিকশিত শতদলে রং ফলানর চেষ্টার ন্যায় বিড়ম্বনাজনক। তাই তিনি কালিদাসের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবারই প্রয়াস করিয়াছেন। যেখানে সেই পথ ঈষৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল-কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন সেই-খানেই একটু রসভঙ্গ হইয়াছে এবং সমালোচকের তীব্রোক্তির হেতু হইয়াছে। কিন্তু এখানেও তিনি অতটা দোষার্হ নন; কেন তাহা পরে বলিতেছি। সে যাহা হউক ইহা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে মুকুন্দরাম প্রণয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতেন, প্রেম যে কেবল কলুষিত ইন্দ্রিয়বিকারমাত্র নহে, তাহা তিনি বেশ হৃদয়-ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্র এই সুন্দর অবকাশ, কবিত্বের এই মনোরম লীলাক্ষেত্র ছাড়িয়া দিয়া শুধু নিজের অবিবেকত্বই করেন নাই, নিজের অসারত্ব ও অরসিকত্ব উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশিত করিয়াছেন তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোনও উচ্চ আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না, কোন মহৎ ভাব তিনি ধারণা করিতে পারেন না

তাঁহার কলুষিত কল্পনায় মহাযোগী মহাদেবের ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অসম্ভব। মদনভস্ম ব্যাপারটা তাঁহার একেবারে প্রবেশ লাভ করে নাই, তাই এই আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা লইয়া তিনি ছেলেখেলা করিয়াছেন। মুকুন্দরামও যাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই, সেই মহোচ্চভাব ভারতচন্দ্রের মত সখের কবির হস্তে পড়িয়া একেবারে বিকৃত ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যে মদনবাণে এত কাতর, সে আবার মদনকে ভস্ম করিবে কি করিয়া, এ কথাটা তাঁহার বিচারহীন মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। মহাদেবের এ সাত্ত্বিক ক্রোধ ধারণা করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না; তিনি শুধু শুধু মদন বেচারাকে ভস্ম করাইয়া শেষে আবার সেই মদন জ্বালায় মহাযোগী মহাদেবকে পাগল সাজাইয়া দেখাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কি ঘৃণিত প্রবৃত্তি! কি অন্ধ ইন্দ্রিয়বিকৃতিপাংশুল হৃদয়! অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন জন্য নিন্দা করেন, অনেকে ভাবেন যে এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ভারতচন্দ্রের অন্তর্নিহিত অশ্লীলতা আর কোথাও ততদূর ব্যক্ত হয় নাই যতটা এই শিবের তপোভঙ্গের চিত্রে হইয়াছে। যে কবি অপর এক মহাকবির আদর্শ নির্ম্মম ভাবে, কুৎসিতভাবে চূর্ণ করিয়া, দেবতার স্থানে পশুর চিত্র আঁকিতে সঙ্কোচের লেশমাত্র বোধ করেন না, যিনি আদর্শ যোগীকে কামোন্মত্ত পশুর সাজে সাজাইতে দ্বিধা বোধ করেন

না, তিনি পরনারীর কামোন্মত্ততা প্রদর্শক বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া নিজের বিকৃতরুচির পরিচয় দিয়াছেন, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়। ভারতচন্দ্রের বিকৃত রুচির বিকাশ সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বপ্রধানভাবে এইখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারত-চন্দ্রের প্রধান দোষ, তাঁহার হৃদয়হীনতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, সবই এই একচিত্রে একত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। কোনও কবির জাতীয় মহান্ আদর্শ খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই, বিশেষতঃ হিন্দু কবি হইয়া হিন্দুর পরম দেবতার মহোপকারী আদর্শ বিনষ্ট করিবার অধিকার ভারতচন্দ্রের আদৌ ছিল না। ইহা দ্বারা তিনি নিজ হৃদয়ের যে হীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। ফলতঃ এই কলুষ-কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়বিকৃতিই ভারতচন্দ্রের কার্য্যের প্রধান দোষ। কোনও সু-সমালোচক বলিয়াছেন যে ইহা, ভারতচন্দ্রের দোষ ততটা নহে যতটা তাঁহার সময়ের দোষ। কথাটা অনেক পরিমাণে সত্য হইলেও তাহাদ্বারা ভারতচন্দ্রের দোষ একেবারে ক্ষালিত হয় না। তিনি যদি বিদ্যাসুন্দর কাব্যেই এই দোষযুক্ত হইতেন তাহা হইলে আমি সে কথায় সায় দিতে পারিতাম, কিন্তু তিনি চক্ষের সমক্ষে একটী বিরাট আদর্শ বর্ত্তমান থাকিতেও তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া অনায়াসে দেবচরিত্র বিকৃত করিয়া যে নিজত্বের প্রমাণ দিয়াছেন, সে আত্ম-বিস্মৃত, ইন্দ্রিয় পরাভূত চঞ্চল ও বিবেকহীন নিজত্বের অপরাধ কেবল সময়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে

রামবাবুর নিকট নিমচাঁদ দত্তের দোষস্খালন-চেষ্টার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। আমি সেরূপ কোনও চেষ্টার পক্ষপাতী নহি।

কবিকঙ্কণ প্রায়ই সমগ্রচিত্রে আত্মসংযম রাখিতে পারিয়াছেন, কেবল একস্থলে একটু আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছেন ও একস্থলে নিজের কথা কহিয়া আদর্শ নষ্ট করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করেন নাই, তিনি বলিয়াছেন, যে মহাদেব যখন যোগভঙ্গ করিয়া পার্ব্বতীদত্ত মালা গ্রহণ করিতে গেলেন তখন কাম সম্মোহনবাণ-প্রয়োগে তাঁহাকে ঈষৎ ধৈর্য্যচ্যুত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই যোগী মহাদেব হৃদয়বলে ইন্দ্রিয়-বিকার নিগ্রহ করিয়া, মদনকে ভস্মীভূত করিলেন। এই স্বাভাবিক এবং উচ্চভাব মুকুন্দরাম একটু সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাইয়াছেন। তিনিও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই যে, যে চিত্র পরমাত্মজ্যোতিঃ-নিরীক্ষণে পর্য্যবসিত সে চিত্তে কামবিকার সম্ভব নহে। এই স্থলে আদর্শ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছে। আর একস্থলে কবিকঙ্কণ স্বকপোল-কল্পিত একটী ঘটনা সংযোজিত করিয়াছেন, শিবের কুৎসিতরূপে আবির্ভাব, পরে মোহনবেশ ধারণ এবং নারীগণের পতিনিন্দা। এগুলিদ্বারা কাব্যের কোনও শোভা বৃদ্ধি হয় নাই, বরং ক্ষতিই হইয়াছে। যাহা কবিকঙ্কণ শেষকালে করিয়াছেন তাহা কালিদাস পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাবধিই কালিদাসের

২

মহাদেব বরবেশে সজ্জিত। এবং কালিদাস মহাদেব-দর্শনে মুগ্ধ স্ত্রীগণের মুখে উদার বচনাবলীই বসাইয়াছেন—সহৃদয়ও সাধারণতঃ সদ্বিবেচক কবি মুকুন্দরাম তবে কেন এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। একজন সমালোচক কহিয়াছেন, "সুপুরুষ দেখিলেই নারীগণের দ্বারা স্বায় পতির নিন্দা করিতে হইবে, প্রাচীন কবিদের এ এক সাধারণ রোগ। যে দেশে পতিপূজা দেবপূজায় উন্নীত, সে দেশে এরূপ বিকৃত রুচি কোথা হইতে আসিল ?" এই প্রশ্নের মীমাংসা আমাদের সমাজের একটি ভয়ঙ্কর কুপ্রথার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ভালরূপে হইবে; সেই কুপ্রথা দেবীবর ঘটক প্রচারিত কৌলীন্য-প্রথা। এই কৌলীন্য-প্রথার মোহে আবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলবালাগণকে যে রাশি রাশি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, অযোগ্য বরের হস্তে ন্যস্ত হইয়া সারা জীবন যে অসহ্য কষ্টে ব্যয়িত করিতে হইয়াছে তাহারই ফলে আমাদের সতীসাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত বঙ্গদেশেও এই অসহ্য-যন্ত্রণা-নিপীড়িতা ললনাগণের মুখে পতিনিন্দা প্রকাশ পাইয়াছে। এই ভীষণ কুপ্রথা মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের সময় সম্পূর্ণরূপে সমাজে উৎপাত করিতেছিল, এবং অসহায়া কুলীন-ললনাগণের বৃদ্ধ নির্গুণ বরের সহিত বিবাহিত হওয়া নিত্য ঘটনার মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই মহাদেবের সহিত গৌরীর বিবাহ-বর্ণনকালে কবির মনে সহজেই এই বিসদৃশ চিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং পরে সুন্দর মহাদেবকে দেখিয়া নারীগণের নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার

দিবার প্রবৃত্তি অশোভন হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরাম ঘরের কথা কহিতে এত ভালবাসেন যে, তাহার সুযোগ পাইলে আর ছাড়িতে পারেন না। তাঁহার রচিত নারীগণের পতিনিন্দা উচ্চ আদর্শানুমত নহে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত কু-ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহাতে অদৃষ্টের ধিক্কার ভিন্ন ইন্দ্রিয়চপলতা প্রকাশ পায় নাই। যেটুকু আছে তাহাতে মনে হয় যেন সেই নারীগণের দুরদৃষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি লিখিতে বসিয়াছেন। ইহা উত্তম রুচির অনুমোদিত না হইলেও ইহাদ্বারা কবির হৃদয়ের কোনও বিসদৃশ ভাবের প্রকটন হয় নাই। কবি এই নিন্দার ভিতরও নিপুণ অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেইরূপ কোনও জঘন্য ভাবের পথ রোধ করিয়া রাখিয়াছেন।

"আপন স্বামী কনকচাঁপা পর শিমুলের ফুল।" ইহা দ্বারা কবি নিজ সংযম বজায় রাখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেও নারীগণের পতিনিন্দা আছে—তাহার পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন নাই, এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, মুকুন্দরামে যাহা বাস্তব দৃশ্য, ভারতচন্দ্রে তাহাই হাস্যরস-অবতারণের চেষ্টা। তা ছাড়া আরও যাহা আছে তাহা বড় গৌরবের বিষয় নহে। সে কথা পরে বলিব।

এই হাস্যরসাবতারণ প্রসঙ্গে এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে, মুকুন্দরাম যে হাস্যরসের অবতারণা করেন তাহা নাটককারের মত চরিত্র সৃষ্টির ব্যপদেশ। ভারতচন্দ্রের হাস্য-

রসের ভিতর একটু নষ্টামি আছে; তাঁহার পরকে অপদস্থ করিয়া হাসিবার ইচ্ছা করে, তাঁহার হাস্যরস একটু Mischievous এ সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা নিজসৃষ্ট নারদের সহিত তুলনা হয়। ঝগড়া বাঁধাইয়া মজা দেখিতে তিনি বেশ কৌতুক অনুভব করেন, লোকের সহিত কার্য্যতঃ পরিহাস (Practical joke) করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার নারদের মতই প্রবল। হরগৌরীর চিত্রের মধ্যে মুকুন্দরাম তদীয় পরিহাস রসিকতার পরিচয় দেন নাই, ভারতচন্দ্র দিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরিত্রের গৌরব ভারতচন্দ্রের যেন দ্রষ্টব্যই ছিল না, অতএব দেবচরিত্র লইয়াও তিনি ঠাট্টা তামাসা করিতে বিরত হন নাই। এই দেখুন শিবের বরসজ্জা লইয়া দুষ্ট নারদ কেবল Practical joke করিতেছেন।—

"নারদ বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া সাজাইতে গেলা বর।
বসেছিলা হর উঠিল সত্বর নারদ কহে তৎপর॥
জটা-জুটে চূড়া সাপ বান্ধ খুড়া মুকুটে কি দিবে শোভা।
কি কাজ মুক্তায় হাড়ের মালায় কন্যার মা হবে লোভা॥
কস্তুরী কেশরে চন্দন কি করে ঘন করে মাখ ছাই।
কি করে মণিতে যে শোভা ফণিতে হেন বর কোথা পাই॥
ফুল-মালা যত শোভা দিবে কত যে শোভা মুণ্ডের মালে।
কাপড়ে কি শোভা জগমন লোভা যে শোভা বাঘের ছালে॥
রথ-হস্তী আর, কি কাজ তোমার যে বুড়া বলদ আছে।
তোমার যে গুণ কব কোটীগুণ আমি মেনকার কাছে॥"

এমন না করিলে নারদের হাসিবার একটা মস্ত সুযোগ ভাসিয়া যায় তাই কবি মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা রূপান্তর করিয়া একটু হাসিয়া লইয়াছেন।

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥"

আদর্শহীনতার দোষ ছাড়িয়া দিলে, আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, মদনভস্মের দৃশ্যে মহাদেবের ছবি আঁকিবার সময় এই নষ্টামিপ্রিয় হাস্যপ্রবণতা কবির মনে একেবারে উদিত হয় নাই। যে কৌতুকময় চিত্রের রেখাপাত সেখানে হইয়াছে তাহাই হাস্যরসিক কবি দীনবন্ধুর হাতে পড়িয়া "বিয়ে পাগলা বুড়োয়" দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সে কথা আর না তোলাই ভাল, কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চিত্রে কবির যে দিক দৃষ্টিগোচর হয় তাহা আদৌ সুখকর নহে। এই স্থলে ভারতচন্দ্রের পরিহাসপ্রিয়তার যেটুকু পরিচয় পাইয়াছি তাহারই আভাস দিয়া রাখিলাম। ইহা আমরা আরও বিকশিতভাবে পরে দেখিতে পাইব।

এক্ষণে ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের হরগৌরী-চিত্রে তাঁহাদের কতটুকু ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের অপরাপর দোষগুণই বা কি রকমে ধরা পড়িতেছে তাহারই প্রসঙ্গক্রমে আর দুই একটি কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। অবান্তর হইলেও উভয় কবির কাব্যেই রতিবিলাপ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই রতিবিলাপ ব্যাপার লইয়া দুই কবির মধ্যে

বেশ একটু তারতম্য লক্ষিত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, কবিকঙ্কণ জীবনের ঘটনার স্বাভাবিকতায় যে কবিত্ব তদ্ভিন্ন অপর কোনও কবিত্বের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না; তাঁহার রতিবিলাপ যথার্থই বিলাপ, তাহার ভিতর দিয়া পতিহীনা রমণীর আর্ত্তক্রন্দন ফুটিয়া উঠিতেছে।

"মোর পরমাণু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।"

কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী করুণাসিক্ত আর্ত্তধ্বনি! ইহাতে উঁহু-উহুর বাড়াবাড়ি নাই, মরি মরি নাই, কিন্তু এ ক্রন্দন প্রাণের সহিত ক্রন্দন। স্বভাবজ্ঞ কবি যতটুকু স্বভাবানুযায়ী ততটুকু লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এই রতিবিলাপের ভিতর কথা বসাইবার বা কবিত্ব প্রকাশ করিবার চেষ্টা মোটেই নাই। অথচ ইহাদ্বারা একটি গভীর শোকের মূর্ত্তি সজীবভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

রতিবিলাপে ভারতচন্দ্র অনেক কথা বলিয়াছেন, অনেকগুলি "উহু" বসাইয়াছেন, কবিত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ ছাড়েন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, রতির বিলাপ কবির মর্ম্মে তো অনেক দূরের কথা, তাঁহার কানেও প্রবেশ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

"অহো অহো হরি হরি, উহু উহু মরি মরি, হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান, এখন দেখিতে আর নাই॥

*　　*　　*　　*

শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি ল'য়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুণের কপালে আগুণ॥"

ইত্যাদি কবিতায় স্বাভাবিকতার পরিবর্ত্তে বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টাই বেশী। কোনও গভীর শোকমগ্না বিধবার প্রাণে "একের কপালে রাহু" প্রভৃতি হেঁয়ালি গড়িবার প্রবৃত্তি আসা যে নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহা কবি ভাবিবার সময় পান নাই।

"আরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান
আগে যাবে পথ দেখাইয়া।
রাজীব চরণ রাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে
হৃদে ধরি লহরে কহিয়া॥"

ইহাতে ভাব আছে সত্য, ভাবটি মনোরমও বটে, কিন্তু কথাগুলি ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। গভীর শোক ভাবের উৎপাদক নহে. তাহা নিদারুণ মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণারই উৎপাদক। এই চারিটী ছত্রে একটি কোমল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু মর্ম্মের বেদনা তেমন ব্যক্ত হয় নাই। যে ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি পাঠকের হৃদয়ে ব্যথার সৃষ্টি করে না, ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে না, তাহা কবিত্বময় হইলেও রস হিসাবে তাহার সার্থকতা বড় বেশা নহে। করুণ-রসের স্থায়ী ভাব শোক, সেই শোকের উত্তাপ যত অধিক ফুটিবে, ততই করুণ রসের গাঢ়তা সম্পাদিত হইবে। শোকের সময় কবিত্ব-স্ফুর্ত্তি হয় না, তাই এই ছত্রচতুষ্টয়ে যাহা সাধিত হইয়াছে তাহাতে রস প্রগাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, বরং রসাভাস

দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। মনুষ্যচরিত্রবিশ্লেষণকালে আমরা ভারতচন্দ্রের ও মুকুন্দরামের রসাবতারণ-শক্তির আরও বিশেষ পরিচয় লইবার অবকাশ পাইব, অতএব এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এই সময়েই বলিয়া রাখা উচিত যে, হরগৌরীর কথাতে ভারতচন্দ্রের প্রধান দোষ যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনই তাঁহার প্রধান গুণের বিকাশও ইহাতেই দেখা দিয়াছে। যে অদ্ভুত শব্দযোজনশক্তি লইয়া তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরজীবী হইয়া আছেন, সেই শক্তি এই হরগৌরীর কথায় সম্পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার শক্তি অসীম, বঙ্গসাহিত্যে এই এক বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এখনও হইল না। অন্নদা মঙ্গল কাব্যের প্রাণ এই শব্দমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। স্বরাধ্যায় বীণায় কি বাজিতেছে বুঝি বা না বুঝি তাহার ধ্বনি কর্ণে মধু বর্ষণ করে; কোকিল কি গায় তাহা কেহ বুঝিতে না পারিলেও তাহার গানে প্রাণ আকৃষ্ট হয়। ভারতচন্দ্রের কলধ্বনিও এমনি মধুর, এমনি চিত্তাকর্ষক।

কল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে,
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে॥
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিল রাজধানী অশোক মূলে

কুসুমে পুণ পুণ ভ্রমর গুণ গুণ
মদন দিল গুণ ধনুক হুলে,
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধু মুদিত মন ভারত ভুলে।

বহুকাল পরে বঙ্গসাহিত্যে আবার এই শব্দমন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস যে শব্দযোজনা-শিল্প আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের হস্তে সেই শিল্প বহুগৌরবসম্পন্ন হইয়াছে। আধুনিক কবিগণের মধ্যে কবিবর রবীন্দ্রনাথ অনেক পরিমাণে এই শব্দ-বৈভবের অধিকারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের কাছে পরাস্ত। কেবল শব্দের সাহায্যে একটী গম্ভীর বিরাট চিত্র অঙ্কিত করিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের মত আর কোনও কবিতে দেখি নাই। "ভারতচন্দ্রের লিপিচাতুর্য্যের গুণ এই যে তাহাতে শ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও পাঠকের নেত্রগোচর হইবে না, শিশুর হাসি ও পাখীর ডাকের ন্যায় তাহা আয়াস ও আড়ম্বর শূন্য। এই শব্দ ও ছন্দৈশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জনৈক সমালোচক ভারতচন্দ্রের কাব্যগুলিকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।"

বলা বাহুল্য যে, এ শব্দচাতুর্য্য বা এই অদ্ভুত শিল্পের পরিচয় আমরা মুকুন্দরামে পাইবার আশা করি না। মুকুন্দরাম নামে কবি, কার্য্যতঃ নাটককার। যাহা স্বাভাবিক ভাব বা ভাষাদ্বারাই স্বাভাবিক, কবি অবিকল তাহা নিজ কাব্য মধ্যে বসাইয়া

গিয়াছেন। তাহাতে সাজসজ্জা অর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। লিপিচাতুর্য্য মুকুন্দরামে একেবারে নাই—লেখার মুখে যাহা বাহির হইয়াছে তাহাই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তিনি যে আগাগোড়াই গ্রাম্যশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে, যখন যাহা ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইয়াছে তখন তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন তা সে সংস্কৃতই হউক বা গ্রাম্যই হউক। আমার বক্তব্য এই যে মুকুন্দরাম পাঠককে কোথাও শব্দমোহে সমাচ্ছন্ন করিবার প্রয়াস করেন নাই, প্রয়াস করিলেও পারিতেন কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁহার হৃদয় অন্য দিকে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের শক্তির বিকাশ এই শব্দচাতুর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। তাঁহার মত কথায় চিত্তহরণ করিতে প্রাচীন কালের অন্য কোনও কবি সক্ষম হন নাই। দীনেশবাবুর এই উক্তি আংশিক মাত্র সত্য; ফলতঃ তাঁহার মত কথায় চিত্তহরণ করিতে এ কালেরও কোনও কবি সক্ষম হন নাই বলিলে সম্পূর্ণ সত্য হইত।

যাহা হউক এই শব্দপ্রয়োগশক্তি কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে, সেই কথা বলিবার কালেই এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। হরগৌরীর কথা উভয় কাব্যের মুখবন্ধস্বরূপ। সেই মুখবন্ধে দুই কবির যে আভাষ পাইয়াছি তাহাই এখন প্রকটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। কবিদ্বয়ের পূর্ণপ্রকাশ তাঁহাদিগের কাব্য মধ্যে প্রবেশ করিলে তবে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা।

আমরা অতঃপর উভয় কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার বিচারে প্রবৃত্ত হইব। চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, আমরা সেই অর্থেই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা কথার ব্যবহার করিয়াছি। মনুষ্য-হৃদয়ের চিত্রও বোধ হয় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ভিতর ফেলা অন্যায় হয় না, কিন্তু এ স্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। কিন্তু মনুষ্য হৃদয়ের চিত্র না হইলেও যথার্থ চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা কল্পনার সাহচর্য্যপ্রার্থী না হইয়া থাকিতে পারে না। চিত্র—ভগবৎসৃষ্ট জীবের ও প্রকৃতির। ইহা কোথাও শুধু বাহ্যমাত্রে ব্যবসিত, কোথাও বাহ্যের সহিত ভিতরটুকুও প্রকাশিত করে। যাহা শুধু বাহ্য দৃশ্যের অঙ্কনে নিবৃত্ত, তাহা উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কন নহে, যাহা অঙ্কিত বস্তুর বাহ্য চিত্রের সহিত তাহার হৃদয়টি পর্য্যন্ত ধরিতে ও দেখাইতে পারে তাহাই যথার্থ প্রতিভাপ্রসূত। একটি মনুষ্যের মুখের ও সর্ব্বাবয়বের ছবি তোলাও চিত্রাঙ্কন এবং সেই ছবিতেই তাহার মনের কার্য্যাবলী প্রকটিত করিতে পারাও চিত্রাঙ্কন ;—প্রথমটির জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহিষ্ণুতার আবশ্যক, দ্বিতীয়টীর জন্য শুধু এই দুই জিনিসে চলে না, ইহাদের সহিত কল্পনার সংমিশ্রণ আবশ্যক হয়। দৈহিক চিত্র আঁকিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, মনের চিত্র আঁকিতে

তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতার প্রয়োজন করে। আপাততঃ আমি কার্য্য দ্বারা বা বিশ্লেষণ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিবার কথা বলিতেছি না, শুধু চিত্রাঙ্কণ দ্বারা সেই ভাব প্রকাশ করিবার কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে কবি বা ভাস্কর্য্য-শিল্পজ্ঞ, অথবা চিত্রকর এই তিনেরই স্থান একত্র। তবে কবির ইহাতে অনেকটা সুবিধা এই যে, চিত্রকর যাহা তুলিকার সাহায্যে ও ভাস্কর যাহা ক্ষোদন যন্ত্রের (Chisel) সাহায্যে প্রকাশ করিতে বাধ্য হন, কবি তাহা কথার সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারেন। তবু কথার সাহায্য পাইলেও, শুধু চিত্রাঙ্কনে মনের ভাব প্রকাশ করা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে।

✓প্রকৃতির চিত্রই বল আর মানুষের মূর্ত্তির চিত্রই বল, শুধু যথাযথ অনুকরণ উচ্চ অঙ্গের কলা নহে। প্রকৃতির চিত্রে তালিকা সম্পূর্ণ করিতে পারিলেই কবির কার্য্য শেষ হয় না, মনুষ্যের চিত্রেও শুধু শারীর বিজ্ঞান (Anatomy) অভ্রান্তরূপে বজায় রাখিতে পারিলেই চিত্রকরের প্রভূত শক্তির পরিচয় প্রদান করা হয় না। ইহার অতিরিক্ত কবির আরও কিছু নিষ্পাদ্য আছে। প্রকৃতির চিত্রে মানুষের মন কতখানি জড়িত প্রকৃতি-সুন্দরীর নিজের হৃদয়টীই বা কতখানি প্রকাশিত,কবির লক্ষ্য ও চেষ্টা তাহাই ধরিতে পারা ; মানুষ যতক্ষণ রক্তমাংস, পেশী ও অস্থির সমষ্টিমাত্র, ততক্ষণ কবির চক্ষে সে অবহেলনীয়, যখন মানুষের শরীরে ভাবদ্বারা মনের প্রকাশ হয়, তখনই কবির দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে চিত্রে কল্পনা-শক্তির বিকাশ

নাই,সে চিত্র বিলোপশীল,কেননা তাহা স্থায়িত্বের দাবী করিবার প্রথম হেতুযুক্ত নহে, অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রকৃতির চিত্র,অথবা মনুষ্যের চিত্র আঁকিবার জন্য চিত্রকরের এই দুইয়ের সঙ্গেই যথেষ্ট সহানুভূতি থাকা আবশ্যক। সহানুভূতি ব্যতিরেকে সত্য প্রকাশ হয় না। সত্য প্রকাশ না হইলে কোনও চিত্রেরই স্থায়িত্ব হইতে পারে না। যাহা কেবল অনুকরণ তাহাতে সহানুভূতি আবশ্যক করে না। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" অথবা "চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে" একথা বলিবার জন্য কোনও কলা-নৈপুণ্য বা সহানুভূতির প্রয়োজন করে না। কিন্তু—

পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবক স্তনাভ্যঃ,
স্ফুরৎপ্রবালোষ্ঠ মনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তর বোহপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি॥

কল্পনা করিতে বহুল পরিমাণে তরু ও লতা বধূর সহিত সহানুভূতির আবশ্যক। প্রকৃতির ভিতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে ও মানুষের শরীরের ভিতর মনের প্রতিষ্ঠা না হইলে তাহা কবির কোনও প্রয়োজনে লাগে না, উদ্ভিজ্জতত্ত্বান্বেষী বা বৈদ্যশাস্ত্রচর্চ্চাশীল ব্যক্তির তাহাতে প্রয়োজন আছে,কিন্তু কবির শুধু এইটুকুতেই তৃপ্তি হয় না। সুধীবর রস্কিন কহিয়াছেন :—

Again it does not follow that because such accurate knowledge is necessary to the painters,that it should constitute the painters, nor that such knowledge is valuable in itself and without reference to high ends.

Every kind of knowledge may be sought from ignoble motions and for ignoble ends and in those who so possess it, it is ignoble knowledge while the very same knowledge is in and this mind an attainment of the highest dignity and conveying the greatest of blessing. This is the difference between the mere botanist's knowledge of plants and the great poet's or painter's knowlede of them. The one notes their distinction for the sake of swelling his herbarium, the other that he may render them vehicle of expression and emotion......Thenceforward the flower is to him a living creature with histories written on its leaves and passions breathing on its motions. ✓

Modern Painters. Vol. 1. Expan X. L. V.

কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা ও উচ্চতা এমন সুন্দর ভাষায় এভাবে কোথাও অভিব্যক্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র দুইজন প্রাচীন কালের কবি, ইহাদের বিষয় বলিবার জন্য এত বড় বড় কথায় ও আধুনিক মতের অবতারণা করিয়া ভূমিকা করিবার প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের সমাধান এখন না করিয়া ইহারই আনুষঙ্গিক আরও দুই একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাহি। প্রশ্নের মীমাংসা পরে আপনা হইতেই এই প্রবন্ধ মধ্যে দৃষ্ট হইবে। কেবল এইটুকু এখানে উল্লেখ করিলে চলিবে যে, যথার্থ কবিত্ব একটি চিরন্তন বস্তু, ভিন্ন দেশে ইহার

ভিন্নরূপ বিকাশ মাত্র হইয়াছে। যাহা কলাবিস্তার বা কবিত্বের সমালোচনা, তাহা এই চিরন্তন সত্যের বিশ্লেষণ বৈ আর কিছুই নয়। অতএব সে কার্য্য যিনিই করিয়া থাকুন, তদুক্ত সমীচীন মত সর্ব্বদেশের কবির বিষয়ে প্রয়োজ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে কোনও বাধা নাই। এই ভাবের কাব্য-সমালোচনাই আজকাল আদর পায় ও সর্ব্বতোভাবে আদর পাইবার যোগ্য। বিশেষতঃ চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার সম্বন্ধে মহামতি রস্কিন যাহা বলিয়াছেন, তাহা এমন একটি সরস উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে তাঁহার মতের সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সে যাহা হউক এখন আমাদিগের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দুই একটা কথা আরও বলিবার আছে। চিত্রাঙ্কন কবিগণের যেমন প্রিয় তেমনি কঠিন। কবিগণ এই চিত্রপ্রকাশ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ভাষা ও অলঙ্কার সাজাইতে ভালবাসেন; কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কার নিতান্ত অবহেলার বিষয় নহে। তবে ইহাও সত্য যে ভাষা কিংবা অলঙ্কার যদি কাব্যের উৎকর্ষ সাধন না করে, তবে তাহা উপেক্ষণীয়। ভাষা সাজাও, আপত্তি নাই, কিন্তু শুধু ভাষা সাজাইও না, সে ভাষার একটা প্রয়োজনীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত করিয়া তোলে, এমন কিছু প্রকাশ কর যাহাতে বুঝা যায় যে, তুমি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছ তাহার যথার্থ প্রয়োজন ছিল। যে ভাষার সাহায্যে একটি বিরাট বা কমনীয় চিত্র ফুটিয়া উঠে, যে অলঙ্কার দ্বারা চিত্রিত বস্তুর সৌন্দর্য্য বা মহত্ব স্ফুটতর হইয়া উঠে, সেই ভাষার ও অল-

ঙ্কারের সার্থকতা আছে। যাহা তাহা না করে তাহা খুব সজ্জিত হইলেও তাহার কোনও মূল্য নাই। কবিত্ব কেবল শব্দ-যোজনার চাতুর্য্য নহে, তবে শব্দ-যোজনার শক্তি কবিত্বের একটি উপাদান বটে। শব্দ যতই মিষ্ট হউক যদি সেই শব্দের সাহায্যে কোনও একটি গভীর ভাব বা মহৎ চিত্র সজীব হইয়া না দাঁড়ায়, তবে সে মিষ্টতা বালকের ভাল লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে সেরূপ শব্দ-জালের মোহবন্ধন অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ও দুর্ব্বল। শব্দ কবির কামনার বস্তু নহে, কামনার বস্তুপ্রাপ্তির উপায় মাত্র। শব্দ-যোজন-চাতুর্য্য কবির মহত্বের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ইহাই তাহার মহত্ব নহে। মহাত্মা রস্কিন ঠিকই বলিয়াছেন যে—

"It is not by the mode of representing and saying, but by what is represented and said, that the respective greatness either of the painters or the writers is to be finally ditermined"—Modern Painters, Vol. I. Page 8.

ভাষার অলঙ্কার সম্বন্ধেও তাঁহার বাক্যাবলী বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন—

"There is therefore a distinction to be made between what is ornamental in language and what is exparessive. That part of it which is necessary to the embodying and conveying the thought is worthy of respect and attention as necessary to excellence though not the bit of it"—Modern Painters, Vol. I. Page 9.

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা কবিদ্বয়ের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা বলিয়াছি যে ভারতচন্দ্রের শব্দ-যোজনশক্তি অদ্ভুত। কিন্তু সে শব্দযোজনা যদি কেবল ছন্দের পারিপাট্যে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের কাব্য এতদিন টিকিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী অনেকগুলি কবিনামধেয় ব্যক্তি পদ্য লিখিয়াছিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি তাঁহাদের শব্দপ্রয়োগচাতুর্য্য অনেক স্থলে ভারতচন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ একটিও জীবিত নাই। মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রণীত "বাসবদত্তা" এখনও জীবিত আছে বটে, কিন্তু তাহাও জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্য যত দোষই থাকুক, তাঁহার শব্দপ্রয়োগশক্তি উচ্চাঙ্গের শিল্পান্তর্ভূত। কেবল এই শক্তির সহায়তায় তিনি এমন এক একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহা বঙ্গবাসীর হৃদয় হইতে কখনও মুছিবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে তাহা হয় নাই সেখানেও তাঁহার পদগুলি এমন একটি স্বরে, এমন একটি মূর্চ্ছনাময় আবেশময় সঙ্গীতের তানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার অর্থের প্রতি বা ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই তাহা আমাদের কর্ণবিবরে ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় মুখরিত হইতে থাকে।

(১)

হর শশাঙ্কশেখর দয়া কর।
বিভূতিভূষিত কলেবর॥

তরঙ্গ-ভঙ্গিত   ভুজঙ্গ রঙ্গিত
কপর্দ্দমর্দ্দিত জটাধর।

গণেশ শৈশব   বিভূতি বৈভব
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥

ভুজঙ্গ কুণ্ডল   পিশাচ মণ্ডল
মহাকুতূহল মহেশ্বর।

রজঃ প্রভাযুত   পদাম্বুজানত
সুদীন ভারত শুভঙ্কর॥

(২)

জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥

শিব শিবকায়া   হর হরজায়া
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে॥

যদি কর মমতা   হত হয় যমতা
দিবি ভুবি মমতা গুহ হেরম্বে॥

তব জন যেবা   সুরপতি কেবা
যম দেই সেবা শির পরিলম্বে॥

ভবজল তরণে   রাখহ চরণে
ভারত চরণে করি কাদম্বে॥

(৩)

জয় কৃতে কেশব   রাম রাঘব
কংশ দানব ঘাতন।

(৩৫)

জয় পদ্মলোচন নন্দ নন্দন
কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥

ইত্যাদি বিষ্ণুস্তোত্র।

(৪)

জয় শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্কশেখর দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক বিষাণ বাদক
হুতাশ ভালক মহত্তর ॥
জয় মুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয় ত্রিলোককারক ত্রিলোক পালক
ত্রিলোকনাশক মহেশ্বর ॥

প্রভৃতি শিবস্তোত্র।

এই সকল ছন্দে শুধু শব্দের সংস্কারমাত্র সাধিত হয় নাই, শুধু বঙ্গভাষা গ্রাম্যভাষা হইতে রাজসভার ভাষায় উন্নীত হয় নাই; ইহাদের ভিতর হইতে যে একটি পুলকময় ঝঙ্কার উঠিতেছে তাহা দ্বারা আমাদিগের মনে বহুদিনের পুরাতন অথচ চিরনূতন বৈষ্ণব কবিদিগের স্মৃতি জাগরুক করিয়া দেয়; কবিতায় সঙ্গীতের মধুরতা সৃষ্টি করে। জানি না ইহাতে ভক্তির গভীরতা আছে কিনা, ইহাতে ভক্তের ভক্তিরসাস্বাদন পিপাসা মিটিবে কিনা, কিন্তু ইহা স্বরমাধুর্য্যপিপাসা সুরচিত্তে যে আনন্দের উৎস খুলিবে সে বিষয়ে ভুল নাই। ইহাতে ভাষাসংস্কারের

বিকট চেষ্টার শ্রম আদৌ লক্ষিত হইবে না, ছন্দের ললিতভঙ্গী ও স্বাধীন গতি কোথাও বিকৃত বা প্রতিহত হয় নাই। এমনি শিল্পনৈপুণ্যে ভারতচন্দ্রের যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার সহিত যখন ভাব বা কবিত্ব আসিয়া মিশে তখন সোনায় সোহাগা হয়।

(১)

ওকি অপরূপ ভঙ্গিমা
চরণে অরুণ রঙ্গিমা।
হইতে সোসর শম্ভু হৈল হর
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা।
থাকিতে অধরে সুধা সাধ করে
সুধাকরে ধরে কালিমা।
ফুলধনু তনু লাজে তাজে ধনু
দেখি ভুরুধনু বক্রিমা।
রূপ অনুভবে মোহ হয় ভবে
ভারত কি করে মহিমা।

(২)

তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জলনাশে নহে তার নিপাত॥

(৩)

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নান হেতু যেয়ো না লো যেয়ো না।

যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা খুলে
কমল কানন পানে চেয়ো না লো চেয়ো না।
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেয়ো না লো পেয়ো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায়ে পাছে ভাঙ্গে কটি ধেয়ো না লো ধেয়ো না।

ভাষার অপ্রতিহত কোমলভঙ্গী এমন আর কোনও বঙ্গ-কবিতায় নাই। ইহাদের দ্বারা যে ভাবসকল ব্যক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ভাব-ব্যক্তির ক্ষমতা ছিল বলিয়া ভারতচন্দ্র নির্জীব শব্দকৌশলীমাত্র নহেন ও সেই জন্যই কালের নিরপেক্ষ সমালোচনায় তদ্‌গর্ভে এখনও নিহত হন নাই। শুধু কথার জোরে বা সৌন্দর্য্যে কোনও কবির মহত্ত্ব ব্যক্ত হয় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও যথেষ্ট শব্দচাতুর্য্য আছে, তাহাতে একটিও অশ্লীল শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সেই মিষ্ট কথার সমষ্টিদ্বারা মানুষের একটা নীচ প্রবৃত্তি মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সে শব্দপারিপাট্যের কোনও মূল্য নাই, এবং ঐ কাব্য-প্রণয়ণ দ্বারা ভারতচন্দ্র নিজের অসারত্ব ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ করেন নাই; ভাবের দোষে 'বিদ্যাসুন্দর' বিশেষ ভাবে দুষ্ট। সে কথা পরে বলিতেছি। আমি বিবেচনা করি যে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী হইতে "বিদ্যাসুন্দরকাব্য" খানি একেবারে তুলিয়া দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না; যদিও তাহার দুই একখানি সুন্দর চিত্র হইতে বঙ্গবাসী বঞ্চিত হয়, তথাপি এমন কুরুচিপূর্ণ কাব্য নিজের অস্তিত্বের বড়াই না করাই ভাল।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে একটা অবান্তর কথার উত্থাপন করিয়া আসল কথার অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছি তাহাই এখন প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিব। শুধু শব্দের বলে ভারতচন্দ্র যেমন চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালা কবিদিগের ভিতর আর কেহ তেমন পারেন নাই। আমাদিগকে একবার সতীর মৃত্যুশ্রবণে ক্রুদ্ধ মহা-রুদ্রের চিত্রকে স্মরণ করিতে হইবে। এ চিত্র বাহ্যচিত্রমাত্র নহে, এ চিত্রে ভাব বিশ্লেষক একটিও কথা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, অথচ ইহাতেই যেন রুদ্ররস সজীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের চক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে, কোথাও বা রুদ্ররসের সহিত বীভৎস রস মিশিয়া সমগ্র চিত্রটিকে এক অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। খুঁজিয়া দেখিলে ইহাতে শব্দচাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নাই, বড়ভাবের কোনও কথা নাই, রাগারাগির একটি শব্দও নাই, অথচ ইহারই ভিতর হইতে যেন একটা বিশ্ববিনাশী ক্রোধ মূর্ত্তিমান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। চিত্রটি বহুবার উদ্ধৃত হইলেও তাহা পুনরুদ্ধার-যোগ্য।

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥

ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে ।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক জলে বহ্নি ভালে ।
বম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্বল দলম্বল গলে মুণ্ডমালা ।
কটিকট্ট সাত্মাম্বরা হস্তিছালা ॥
পচা চর্ম্ম ঝুলি করে লোল ঝুলে ।
মহাঘোর আভা পিনাকে ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে ।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে ॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা ।
হুহুঙ্কার হাঁকে উড়ে সর্পবাণা ॥
চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী ।
মহকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সবে যজ্ঞনাশে ।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।
অরে রে রে দক্ষ দে রে সতীরে ।
ভুজঙ্গী প্রয়াতে কহে ভারতী দে ।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

আমরা একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে খণ্ডিত করিবার কোনও

কারণ দেখিতে না পাইয়া সমগ্র চিত্রটিই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাকে অনেকে খণ্ডিত করিয়াছেন নিজেদের পসন্দসই করিয়া লইবার জন্য, কিন্তু আমার মতে তাহার কোনও আবশ্যকতা ছিল না। ধূম বাদ দিয়া অগ্নি জালা যায় না, ধূমের সহিত মিশিয়াই, অথবা ইহা বলিলে আরও ঠিক হয় যে ধূমাবৃত হইয়াই অগ্নির সম্পূর্ণতা। চতুর্দ্দিকে এই পিশাচী পিশাচের, ভৈরব ভৈরবীর মধ্যে থাকিয়াই মহারুদ্রের রৌদ্রত্ব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এই সকলে মিশিয়া যেন একটা প্রলয়-কালীন ঝড়ের সৃষ্টি হইয়াছে, যেন সেই ঝটিকোত্থ ধূলিদ্বারা আবৃত গগনের গায়ে "অবৃষ্টি সংরম্ভ অম্বুবাহের" ন্যায় মহারুদ্র-মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; এবং সেই অম্বুবাহের গর্জ্জন "অরে রেরে দক্ষ দেরে সতীরে" যেন আমাদের হৃদয়পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া সেই রুদ্রহৃদয়ের গভীর ক্রন্দন আমাদের হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত করিয়া দিতেছে।

এই বিরাট মহৎ চিত্রে ভাবের ফেণিল উচ্ছ্বাস নাই, কিন্তু এক একটি কথায় যেন মহারুদ্রের-সমস্ত ভাবটি মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। "ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে" এই কথা কয়টিতে যেন উদগীরিত অনলরাশি আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। "ধন্যাত্মক শব্দগুলিতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে "ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা"। এই ছত্রে তরঙ্গের তিনটি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ছলচ্ছল" জলের প্রবাহব্যঞ্জক, "টলট্টল" জলের নির্ম্মলতা-ব্যঞ্জক, 'কলকল' জলের নিক্বণ-

ব্যঞ্জক ঃ—গঙ্গাতরঙ্গের এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা বোধ হয় আর কোনও কবিই করিতে পারেন নাই।

দীনেশবাবু ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে’ এই সমগ্র চিত্রটির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। “স্থানে স্থানে শুধু ছন্দও শব্দের ঐশ্বর্য্যে কোনও মহামহিমান্বিত মূর্ত্তির অপূর্ব্ব অবতারণা হইয়াছে; (ইহার পর তিনি এই চিত্রের কতক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন)···নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মহাদেবের যে ভৈরব সুন্দর চিত্রখানি জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা কাব্যসাহিত্যের শীর্ষদেশে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহাতে কবির ভাষাও ছন্দের উপর আশ্চর্য্য অধিকারপ্রতিপন্ন হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে হরগৌরীর চিত্র দুই কবিতেই প্রায় একই রকম আছে। এ শিব-সৈন্যের চিত্র কবি মুকুন্দরামেও আছে, তুলনার্থ তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

“ছিণ্ডিয়া ফেলিল কোপে মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হইল তথি সঙ্গে বীর ঘটা॥
তিন সূর্য্য সম তার তিনটা লোচন।
মাথায় মুকুট তার ঠেকিছে গগন॥
শূল হস্তে রাহু বীর শিবের সম্মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥

* * * * *

আজ্ঞা পায়ে বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি করিয়া যতেক সেনাপতি।

সঙ্গে ষোল কোটি লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা॥
বীরভদ্রের তেজ যেন সূর্য্যের প্রকাশ।
অন্ধকার করি দানা চলিল আকাশ॥
পদভরে টলমল করয়ে ধরণী।
ধূলায় আচ্ছাদিত হইল দিনমণি॥"

টীকা টীপ্পনীর দ্বারা চিত্রদ্বয়ের পার্থক্য বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। মুকুন্দরামের চিত্র ভারতচন্দ্রের চিত্রের পাশে নিতান্ত ম্লান নিষ্প্রভ। ভারতচন্দ্রের মত শব্দযোজনা দ্বারা কোনও মহিমময় চিত্র অঙ্কন করিবার শক্তি মুকুন্দরামের ছিল না, তাহা আর একটী চিত্র হইতে প্রতিপন্ন করিতেছি। সে চিত্র আদ্যা-শক্তির সংহার-মূর্ত্তি কালীর চিত্র। মুকুন্দরামের চিত্র এইরূপ :—

শঙ্খযুত ক্ষিতিপাণী কালী কপালমালিনী
সিংহমুখী করাল বদনা।
মুখে অট্ট অট্ট হাস করে ধরি অসিপাশ
খট্টাঙ্গধারিণী ঘোর রদনা॥
দ্বীপী চর্ম্ম পরিধানা শুষ্ক মাংস ভীষণা
বিস্তারবদনা ভয়ঙ্করা।
লোলজিহ্বা ঘোর মুখী নিমগ্না লোহিত আঁখি
নিনাদে পুরিল দিগন্তরা॥

এ বর্ণনায় দেবীর কোন অঙ্গহানি হয় নাই, কথাগুলি মুকুন্দরামের নিজের নহে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে আনীত সমস্ত বর্ণনাটাই সপ্তশতীর অনুবাদ মাত্র।

"কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তা মিলাশিনী!
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা॥
অতি বিস্তারবদনা জিহ্বা ললনাভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদ-পূরিত দিঙ্মুখা॥

অতএব এখানে মুকুন্দরামের কৃতিত্ব কিছুই নাই বলিলেও চলে। কিন্তু ভারতচন্দ্র এই ভয়ঙ্করী মাতৃমূর্ত্তির এক অপূর্ব্ব ভীষণ মনোহর চিত্র আঁকিয়াছেন, শুধু আঁকিয়াছেন তাহা নহে, তাহাকে শব্দমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়া প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন :—

মা কালিকে

কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ড মুণ্ড মুণ্ড খণ্ডি খণ্ড মুণ্ড মালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘ জট্ট মুক্তকেশ জালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচণ্ড ভালিকে।
লীহ লীহ লোহ জীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
সৃক্ক সৃক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজি রাজিকে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্দি ভিন্দি ভাষিকে॥
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্ত হালিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্য গীততালিকে॥
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাতি শুম্ভ বারিকে।
শম্ভুবক্ষ পাদ লক্ষ পাদ পদ্ম চারিকে॥

খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য গর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব কারিকে।
সিংহভাব ঘোর রবে ফেরুপাল পালিকে॥

এই চিত্রে সমস্ত কথাগুলির অর্থ বোধ হয় না, কিন্তু আত্ম-প্রকাশক শক্তি আছে। জগতের বুকের উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝঞ্চার মত চিত্রটি আমাদের বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়, একটা ভীষণ শক্তির আকর্ষণে আমরা মুগ্ধ বশীভূত আত্মহারা হইয়া পড়ি, বুঝিতে পারি যে, যে শক্তিসাধক শব্দমন্ত্রে এই প্রলয়ান্তিকামূর্ত্তিকে সজীব করিতে পারিয়াছেন তাঁহার কেন মৃত্যু নাই।

আনন্দ ও কোমলতার চিত্র-প্রকাশেও ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব বড় কম নহে, এখানেও তাঁহার অবলম্বন শব্দসজ্জা। এই শব্দমন্ত্রের বলে তিনি অনায়াসে একটা গম্ভীর চিত্রকে আনন্দময়রূপে দেখাইতে পারেন, একটা বিরাট চিত্রকে শান্তিময় করিয়া ফেলিতে পারেন। মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তি আমরা দেখিয়াছি, আনন্দময় মূর্ত্তিও দেখিয়া লই ঃ—

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জট লপটি পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥

গর গর গর গরজে ফণী ।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি ॥
ধক ধক ধক ভালে অনল ।
তর তর তর চাঁদ মণ্ডল ॥
সর সর সরে বাঘের ছাল ।
দল মল দোলে মুণ্ডের মাল ॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল ।
তা তা থেই থেই বলে বেতাল ॥
ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল ।
ডিম ডিম বাজে ডমরু ভাল ।
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা ।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গ। ॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে ।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে ॥

শুধু কথার পরিবর্ত্তনে ভাবের অপূর্ব্ব রূপান্তর। যুক্তাক্ষরের কৌশলময় প্রয়োগে ও ছন্দের গাম্ভীর্য্যে যে চিত্র বিরাট ও ভয়ঙ্কর, যুক্তাক্ষর-বর্জ্জন ও কোমলছন্দে সেই চিত্রই আনন্দময়। এই কথায় ও ছন্দের সাহায্যেই চিত্র আবার অন্যত্র শান্তিময় হইয়াছে :—

জয় জয় হর রঙ্গিয়া
কর বিকশিত নিশিত পরশু
অভয় বর কুরঙ্গিয়া ॥

লক লক ফণি জটা বিরাজ,
তক তক তক বাজী রাজ
ধক ধক ধক দহন সাজ
বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল,
হুলু হুলু হুলু যোগিনী রোল
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল
প্রমথ প্রমথ সঙ্গিয়া।
ভভম্ ভভম্ ভভম্ ভাল
ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল
রুদ্রতালে দেয় বেতাল
ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া॥

এই চিত্রগুলিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সবগুলিতেই উপকরণ একই, কিন্তু উপকরণগুলি অবস্থা-বিশেষে কার্য্য করিতেছে বহুবিধ। ইহাদের আরও বিশেষত্ব এই যে একটি বিশ্বমনোহর দেবমূর্ত্তির সহিত প্রকৃতির অনেকখানি জড়িত হইয়া আছে; এক মহাদেবের মূর্ত্তির সহিত গঙ্গার মূর্ত্তি, চাঁদের মূর্ত্তি, অনলের মূর্ত্তি, সর্পের মূর্ত্তি, অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, কবি একের বর্ণনাকালে এই সকল গুলির বর্ণনা করিবার অবকাশ পাইয়াছেন ও অনিন্দ্যকৃতিত্বের সহিত তাহাদিগের অবস্থাভেদে রূপভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা প্রথম চিত্রে সর্ব্বগ্রাসী অনল, তাহাই দ্বিতীয় চিত্রে যেন আলোকের শোভা। একে যেমন গঙ্গার একটা উদ্দাম গতি, অপরে তেমনি আনন্দময় নির্ঝরমূর্ত্তি, আবার

তৃতীয় স্তরে শান্ত প্রবাহ। একটি চিত্রে মুণ্ডমালার দোলনির সহিত যেন আমরা মহারুদ্রের হৃদয়ের উন্মত্ত স্পন্দন অনুভব করিতেছি, অপরটিতে আনন্দনৃত্যে বুকে ফুলের মালার দোলনির মত মুণ্ডমালার আন্দোলন আনন্দই ব্যক্ত করিতেছে। একটি চিত্রে চন্দ্রের কিরণও যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, অপরটীতে চাঁদ যেন হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া চলিয়া সরিয়া যাইতেছে, ধরা দিতে চাহিতেছে না। এই সুন্দর চিত্রগুলিতে শুধু একটি দেবমূর্ত্তি জাগরূক হইয়া উঠে নাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সুন্দরীর মধুর মূর্ত্তিও যেন জাগরূক হইয়া পড়িয়াছে। জানি না বঙ্গসাহিত্যে কোন কবি এমন আয়াস-বিরহিত উচ্ছ্বাস-বিহীন সরল ও সহজ উপায়ে আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন কি না। ভারতচন্দ্র কবি শুধু ছন্দকর্ত্তা নহেন, আমরা এই সকল স্থলে তাহা বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্রের মনে একটি চিত্র প্রথমে জাগিয়া উঠে, সেই চিত্র প্রকাশের জন্য যেন কথাগুলি আপনি আসিয়া যোগায়; কথাগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে, তাঁহার অধীন হইয়া কার্য্য করে, নিজেদের দেহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সারকাসের রিং মাষ্টারের চাবুকের ঘায়ে ক্রীড়া-প্রদর্শকগণের মত সেই চিত্র সজ্জিত করিবার জন্য আসিয়া জুটে। ভারতচন্দ্রের শব্দপ্রয়োগশক্তির ইহাই বিশেষত্ব।

ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ না হইলেও মুকুন্দরামও চিত্রাঙ্কন-কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। তাঁহার তুলিকায় বিরাট চিত্র তেমন ভাল

ফুটে নাই বটে, কিন্তু কোমল চিত্র অনেকগুলি ফুটিয়াছে। কালীদহের চিত্র প্রসিদ্ধ।

শ্বেতরক্ত নীল পীত, শতদলে বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।

*　　*　　*　　*

অপরূপ দেখি কালীদহে॥
কমল কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাহি টুটে
চিত্র গন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥
মধুকর সনে বধু বিকচ কমলে মধু
পান করি গায় কলগীত।
গীতে সমাহিত মন দলে দলে মৃগীগণ
যেন রাহু চিত্রের নির্ম্মিত॥
কমল পরাগে গোর, আমার লোচন চোর
ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল।
ক্ষণেক কৈরবে বসে ক্ষণে মত্ত মধুরসে
বিরহী জনার চিত্তশূল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামি তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
নাহি লখি কিবা হেতু একাকালে ছয়ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকর কেতু বরিয়া শরৎ ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত॥

রাজহংস করে কেলি, কৌতুক মৃণাল তুলি
প্রিয় মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চু পুটে বিন্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন।

ইহাকে আমি একটি নিরাবিল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বলিতে পারি। এই চিত্রে প্রকৃতির একখানি অখণ্ডিত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে; কুমারসম্ভবের তৃতীয় অঙ্কের সুন্দর চিত্রের আভাস ইহাতে পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্যসংযত, অথচ আনন্দময়। এই আনন্দময় দৃশ্যের মধ্যে কবি 'কমলে কামিনী'কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এমনি একটি সুন্দর চিত্রের মাঝখানে ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সে চিত্রখানিও কল্পনার দ্বারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতচন্দ্রের নিজস্ব যে বর্ণোজ্জ্বলতা, ভাষার লীলাচাঞ্চল্য, তাহাও অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে—

মধুমাস প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল ঝঙ্কারে।
গুণ গুণ গুণ গুণ ভ্রমর ঝঙ্কারে॥
সুশোভিত তরুলতা নবদলপাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে॥
অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে।
সুখে দোলে মন্দ বায়ে জলের হিল্লোলে॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান॥

শুষ্ক তরু শুষ্ক লতা রসেতে মুঞ্জরে।
মঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুম ছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্ল পক্ষ যাহে জগৎ উল্লাস॥

"তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে" এই পংক্তিতে "নবদল পাত্রের" হৃদয়ের আনন্দটুকু যেন মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। জগতের এই উল্লাসময় অবস্থায় "বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে।" সঙ্গে সঙ্গে জগদুদ্ভাসিনী প্রকৃতিতে যেন কোন সঞ্জীবন মন্ত্র-প্রভাবে জীবনী ও হ্লাদিনী শক্তির আবির্ভাব হইল।

কমল পরিমল, লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে;
বসন্তরাজ আনি ছয় রাগিণী রাণী,
পাতিল রাজধানী অশোক মূলে॥

কবির চক্ষে প্রাকৃতিক কোন দৃশ্য বা কোন ভাবই নির্জ্জীব নহে, সকলই যেন উজ্জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, আনন্দ বিলাইতেছে ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে। ইহা শুধু তালিকা নহে। প্রকৃতিকে এই ভাবে দেখাই যথার্থ কল্পনার কাজ। কবির হৃদয়ের আনন্দ, নূতন ছন্দে মৃদুল ভাষায় কমল-পরিমলবাহী শীতল জলের মত যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু এখানে কবির আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল নহে,

সংযত ; তাই এই চিত্র সুন্দর। সৌন্দর্য্য বাহ্যোপকরণে সৃষ্ট হউক বা হৃদয়োপকরণেই সৃষ্ট হউক সংযত না হইলে তাহার গরিমা নাই।

এই চিত্রদ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা ইহাদের মধ্যে একটুখানি তারতম্য দেখিতে পাই, সে তারতম্য শুধু শব্দ ও ছন্দের নহে। একজন ছন্দ ও শব্দের ঐন্দ্রজালিক, আর একজন তাহা নহেন, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যায়। প্রভেদটুকু এই যে কবিকঙ্কণের চিত্র সুন্দর বটে, কিন্তু তাহাতে কুমুদ-কহ্লারের পুষ্পত্ব ঘুচে নাই, এই পুষ্পত্বের যে বর্ণ-বৈচিত্র তাহা স্বাভাবিক ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহারা অচেতন পুষ্প ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের চিত্রে প্রাকৃতিক পদার্থগুলি সচেতনত্ব লাভ করিয়াছে—Ruskinএর ভাষায় Thence forward the flower is to him a living creature with histories written on its leaves and passions breathing in its motion. It is no mere point of colour, no meaningless spark of light.

চিত্রাঙ্কণে ভারতচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির চিত্র তিনি অধিক অঁকেন নাই। মুকুন্দরাম অনেকগুলি প্রকৃতির চিত্র অাঁকিয়াছেন। যথাযথ বর্ণনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রকৃতির যে মূর্ত্তি তিনি যখনই আঁকিয়াছেন তখনই তাহা নিখুঁত ফটোগ্রাফের মত প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কলিঙ্গে ঝড়ের বর্ণনা এইরূপ একখানি নিখুঁত ছবি।

"ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমিষেকে ঝাপে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
কলিঙ্গে থাকিয়ে মেঘ করে ঘোরনাদ।
প্রলয় ভাবিয়ে প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বিমুখিয়া ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দিল রড়॥
ধূলি আচ্ছাদিত হৈল সকল পুরীতে।
উঠি বসি করে সব প্রজা চমকিতে॥
চারি মেঘ বরিষয়ে অষ্টগজ রাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গ তড়কা বাজ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
ঘন বজ্রধ্বনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সেওয়া সকল লোক জনক জননী॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ধ্বনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥

কবিকঙ্কণের দৃষ্টি সূক্ষ্ম, তাঁহার চক্ষে কোনও অঙ্গটি বাদ পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনটাকেও তিনি যেন চক্ষের সামনে দেখিতে পান। নদীর বন্যার মূর্ত্তি তিনি দুইটি ছত্রে

এত নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, মনে হয় যেন ধবল-বন্যা আমাদের চক্ষের উপর সপ্ততাল হইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে :—

পূর্ব্বদিকে আইল বন্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ততাল হ'য়ে গেল মগরার জল ॥

ভারতচন্দ্রেও ঝড়ের বর্ণনা আছে, তাহাও অঙ্গহীন হয় নাই সত্য ; কিন্তু মনে হয় যেন কবিকল্পনার সাক্ষ্য সে ঝড়ের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে নাই, তাই তাহা অনেকটা কৃত্রিমতা দোষের ভাগী হইয়াছে। তাহা হইলেও ইহাতে কবির সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় ভেকের স্বরের বর্ণনায় বেশ পাওয়া যাইতেছে। সন্ধ্যায় গা ঢাকা অন্ধকারে কেহ যদি জল-কল্লোলিত পল্লীর মাঠে বর্ষার শোভা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ভেকের মকমকানি সমস্ত স্বরের সহিত কেমন ঐক্যতানে সংবদ্ধ।

মুকুন্দরামের প্রকৃতির চিত্রে একটি বিষম দোষ আছে; তিনি একই চিত্র একই কথার বার বার বর্ণনা করেন, তাহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র্য প্রদান করেন না, সুতরাং সেগুলি একঘেয়ে হইয়া পড়ে। এদোষ তাঁহার অন্যান্য বর্ণনায়ও পাওয়া যাইবে। ভারতচন্দ্র যেমন শব্দের চাতুর্য্যে একই চিত্র বহুমূর্ত্তিতে দেখাইতে পারেন মুকুন্দরাম তাহা পারেন না। মুকুন্দরাম কবি, শিল্পী নহেন, ইহা হইতেই তাহাই প্রমাণ হয়।

মুকুন্দরাম কিম্বা ভারতচন্দ্র এ দুই কবির কেহই প্রকৃতির উপর নিজেদের সৃষ্ট পাত্র-পাত্রীর মনের ভাব চাপাইয়া দেন

নাই। "Pathetic fallacy" অথবা উৎপ্রেক্ষা অবস্থা বিশেষে একটি সুন্দর কাব্যালঙ্কার হইলেও তাহা প্রকৃতির সহিত সহানুভূতির লক্ষণ নহে, এবং কথঞ্চিত মিথ্যারাগরঞ্জিত। সুকবিগণ এইজন্য প্রায়ই ইহার বর্জ্জন করিবার প্রয়াসী ও পক্ষপাতী। বরঞ্চ নিজের বা নিজসৃষ্ট পাত্রপাত্রীর মনের অবস্থা যেমনই হউক না কেন, তাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা নিজত্ব লোপ করেন না। আমার মনে যে দিন আনন্দ সেইদিন প্রকৃতিসুন্দরীকেও হাসিতে হইবে, যে দিন আমি সুখী, সেদিন ঝড়বাদল হইবে না এবং যেদিন আমি দুঃখী, সেদিন কোন ক্রমেই চাঁদ উঠিবে না, এমন কিছু লেখা পড়া নাই; অতএব Pathetic fallacy দ্বারা প্রকৃতির চিত্র প্রকাশ করিতে গেলে আমাদের মনের চিত্র ফুটিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির চিত্র ম্লান হইয়া পড়ে। কবি মুকুন্দরাম প্রকৃতিকে এমন ক্ষুদ্র ভাবে দেখেন নাই। আমরা দেখিতে পাই যে, মুকুন্দরামের কবিত্ব অনেক পরিমাণে কালিদাসের কবিত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত। কালিদাসের কাছ হইতে মুকুন্দরাম প্রকৃতিকে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা দিতে শিখিয়াছিলেন। প্রকৃতি-সৃষ্টি যে কেবল মানুষের সুখের জন্যই হইয়াছে, এ কথা মুকুন্দরামের মনে একবারও উদয় হয় নাই। তাঁহার কাছে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই এক দেবতার আদেশে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে, মানুষ ও প্রকৃতি এক অচ্ছেদ্য সৌহৃদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ; তাহারাও আলাপ-সম্ভাষণের যোগ্য, ঝগড়া করিবার যোগ্য। বিরহিনী

খুল্লনার বিরহক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রকৃতির কোনও সৌন্দর্য্যই লুপ্ত হয় নাই, তাহার চক্ষে তরুলতা ভ্রমর ভ্রমরী কোকিল সকলেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে; লতিকা এত দুঃখেও তাহার বেদনা জানাইবার সখীস্বরূপ।

"মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন ॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক কানন।
কুসুম পরাগে মত্ত হৈল অলিগণ ॥
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন সই তুমি বড়লোক ॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপ কহনা সই তপ কৈলে কোথা ॥
আমা হৈতে জনম তোমার হৈল ভাল।
তোমার সোহাগে বন করি আছ আলো ॥
ময়ূর ময়ূরী ডাকে সুমধুর ডাক।
শুনিয়ে খুল্লনার চিত্তে বড়ই বিষাদ ॥
একফুলে মধুপিয়ে ভ্রমর দম্পতি।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে একমতি ॥"

খুল্লনার হৃদয়ে বিষাদ বর্ত্তমান বলিয়া কবি তো প্রকৃতির একটি সৌন্দর্য্যেও লোপ করেন নাই, খুল্লনার দৃষ্টি সকল সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট করিতেও বিরত হন নাই। এখানে কেহ বা খুল্লনার সখী, কেহ বা খুল্লনার বিনয়পাত্র, কেহ বা খুল্লনার কাছে গালি খাইতেছে।

ভ্রমরী ভ্রমর তোরে যুড়ি কর,
না গেয়ো মধুরগীত।

খুল্লনা কোকিলকে ডাকিয়া বলিতেছে ঃ—

বধ কৈলে অনাথা যুবতী॥
আর যদি কাড় রা মদনের মাথা খা,
বসন্তের শতেক দোহাই।
তোর রব সম শর অঙ্গ কৈল জর জর,
অনাথীরে তোর দয়া নাই॥

একটা জাতীয় সহানুভূতির ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মুখে এমনি একটী তিরস্কার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই যে বিশ্বের সহিত, বিশ্বের খুঁটিনাটি সকলের সহিত আত্মীয়তা, ইহাই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণোদিত কবিগণ এই আত্মীয়তা ভুলিয়া প্রকৃতিকে নিজেদের আমোদের উপাদানস্বরূপ কল্পনা করিতে শিখিতেছেন। বহিঃ প্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্ব্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহাদের কাছে প্রকৃতি হয় স্বকীয় প্রীতির বস্তু, নচেৎ তাহা বিরোধীয় বস্তু। তাহাকে বাধ্য করিয়া নিজেদের দাসত্বে নিযুক্ত করা তাঁহারা পরমপুরুষার্থ মনে করেন। স্বয়ং সেক্ষপীয়র Ariel চরিত্রে সেই বিরোধ-ভাবের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির কার্য্য আর্য্য সাহিত্যে

বড় সুন্দর ভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রবিবাবুর সরল ভাষায়—"সে কাজ টেম্পেষ্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে, তাহা সৌন্দর্য্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ॥"

মুকুন্দরামের বর্ণনায় ইন্দ্রিয়পরতা এবং আধ্যাত্মিকতা এই দুই দোষই স্বাভাবিক সরলতার সহিত পরিহৃত হইয়াছে। প্রকৃতির দৃশ্যগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতা দোষ বর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মনের কার্য্য প্রবর্ত্তক করিয়া ইন্দ্রিয় পরতার দোষও বর্জ্জন করিয়াছেন; প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে এই দুইটী দোষ বড় সহজেই প্রবেশ লাভ করে। প্রকৃতিকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াও যাঁহারা কেবল তাহার ভিতর হইতে তথ্য নিষ্কাশন করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা-দোষে দূষিত হয়েন। Wordsworth ইহার নিদর্শন। আর যাঁহারা প্রকৃতিতে কেবল চক্ষু কর্ণাদির তৃপ্তি সাধিত করিবার উপায় খোঁজেন তাঁহারা ইন্দ্রিয়পরতা-দোষাক্রান্ত; Thompson প্রভৃতি কবিগণ ইহার নিদর্শন। প্রকৃতিবর্ণনবিষয়ে কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই এই দুই শ্রেণীর কবিগণ হইতে একটু পৃথক্।

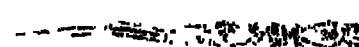
সে পার্থক্য তাঁহাদিগের জাতীয় শিক্ষা হইতে আসিয়াছে। এ বিশ্বজগতের সকলি যে বিশ্বনিয়ন্তার একটী সুন্দর সুবর্ণসূত্রে মণিগণের ন্যায় গ্রথিত, সকলেই সকলের আত্মীয়, এ সংস্কার আমাদের জাতীয় সংস্কার। অতএব আমরা প্রকৃতিকে অন্ত

চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। সে শিক্ষা যে আমরা বিকৃত সংস্কার-বশতঃ ভুলিতে বসিয়াছি ইহাই দুঃখের বিষয় এবং এই জন্যই বলিয়াছি যে আমাদিগের প্রাচীন কবিদিগের চর্চ্চা করিলে সময় নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না।

প্রকৃতির চিত্র যেমন চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার অন্তর্গত, মনুষ্যের রূপ-বর্ণনাও তেমনি তাহারই অন্তর্গত। রূপ-বর্ণনা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে অনেক আছে। কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। রূপ-বর্ণনার উপমাদি অলঙ্কার কবিগণের আশ্রয়নীয়। কিন্তু উপমা বা উৎপেক্ষা যতটুকু স্বাভাবিক ততটুকু প্রযুক্ত হইলেই রূপবর্ণনা স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, নচেৎ তাহা অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। যাহা রূপটুকু ফোটাইবার জন্য প্রয়োজন তাহাই শোভন অলঙ্কার, যাহা কেবল বর্ণোজ্জ্বলতা-প্রদান-সংকল্পে প্রযুক্ত হয়, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়—তাহা শুধু বাহাদুরিতে দাঁড়ায়। ভারত-চন্দ্রের রূপবর্ণনায় এই দোষ লক্ষিত হয়। তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার রূপবর্ণনা অত্যন্ত কৃত্রিম। মুকুন্দরামের রূপবর্ণনায় অলঙ্কার-বাহুল্য আছে সত্য, কিন্তু সে উপমা-বাহুল্যের সহিত তাঁহার হৃদয়ও জড়িত, তাহাতে কেবল উৎপ্রেক্ষার ঘটা দৃষ্ট হয় না। যে মূর্ত্তিটী তিনি আঁকিতে ইচ্ছা করেন তাহা সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়। কমলে কামিনীর চিত্রটী এইরূপ মধুর। অন্নপূর্ণার মোহিনী মূর্ত্তিতেও ভারতচন্দ্র এমন স্বাভাবিকতা দিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্র এখানে

নিজস্ব খর্ব্বে একটু মত্ত হইয়াছেন। তিনি অন্নপূর্ণার কমনীয় মূর্ত্তিটী চিত্রিত করিতে গিয়া 'কেমন লিখিতেছি' এই কথাটী ভুলিতে পারেন নাই। বার্দ্ধক্যের চিত্র উভয় কবিই নিপুণ-ভাবে আঁকিয়াছেন। দরিদ্রের চিত্রও কবির কাব্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকলের বিশ্লেষণের স্থল অন্যত্র। চরিত্র সৃষ্টির বিচারকালে এই সকল চিত্রের কথা আমাদিগকে অবার উথাপন করিতে হইবে। অতএব আমরা এইখানেই মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার বিষয়ে আমা-দের বক্তব্য শেষ করিলাম।

মুকুন্দরামে ও ভারতচন্দ্রে যথার্থ ইতর-বিশেষ কোথায় তাহা তাঁহাদিগের কাব্যসৃষ্ট চরিত্র বিশ্লেষণ না করিলে বুঝা যাইবে না। অতঃপর আমরা তাহার আলোচনা করিব।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সমাজচিত্র।

কবি মুকুন্দরামের কাব্য রসাত্মক বাক্য এবং সেই রসাত্মক বাক্যের সৃষ্টি করিবার জন্য যে সহৃদয়তার আবশ্যক তাহার প্রচুর অধিকারই মুকুন্দরামের প্রধান গৌরব। সেই সহৃদয়তার বলে কবি যখন যে রসের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাহা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতার সহিত প্রকটিত হইয়াছে। এই সহজ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্য যেন অবলীলাক্রমে, অবিরামগতিতে নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে যাহা কিছু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সকলই কবির তুলিকাস্পর্শে উজ্জীবিত হইয়া তাঁহার কাব্যে স্থান লইয়া বসিয়াছে। সেইজন্যই মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা তদানীন্তন সমাজের একখানি অখণ্ডিত চিত্র দেখিতে পাই। আবুল-ফজেলের আইন-ই-আকবরীতে যত কথা, যত তথ্য আমরা জানিতে পারি, ততোধিক তথ্য আমরা মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারি। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, মায় বাজারদর পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। বাঙ্গালীর ঘরের কথা, তাহাদের নাম, তাহাদের আমোদ-আহ্লাদ, তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য; তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের ভোজন-শয়ন, গমনাগমন, শিক্ষা-কুসংস্কার, পূজাপার্ব্বণ,

ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই আমরা এই কাব্য হইতে জানিতে পারি। তাই বলিয়া যে মুকুন্দরাম এই সকলের বিবরণ দিবার জন্যই উদ্যোগী হইয়া কবির পদ পরিত্যাগ করিয়া, ঐতিহাসিকের আসন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা যেন কেহ না ভাবেন। যে সর্ব্বদর্শিত্বের প্রভাবে সেক্ষপীয়র একটী অশ্বের ও কালিদাস একটি ধাবমান মৃগের সমস্ত বিশেষত্বটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কবিকঙ্কণও সেই গুণশালিত্ববশতই এই সকল বিষয়ের বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি তাঁহার এত স্বভাবসিদ্ধ যে সেগুলি না বর্ণনা করিলে তাঁহার মনে যেন একটা কিছুর অভাব আসিয়া পড়িত। এতদ্ভিন্ন এটাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব কবি চরিত্রাঙ্কনব্যপদেশে এমন অনায়াস কৌশলের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে আমরা বেশ ধারণা করিতে পারি যে, উহা তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলির সম্পূর্ণতা সাধনার্থ অত্যাবশ্যক। সূক্ষ্মদর্শিতা মুকুন্দরামের একটি স্বাভাবিক গুণ, তাই এই সকল চিত্রে কোথাও অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ আমাদের মনে হয় যে এই সকল তথ্য মুকুন্দরাম যে যে স্থলে যেমন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তেমনটি না করিলে তাঁহার কাব্যের অঙ্গহানি হইত।

ভারতচন্দ্রে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ইহার বিপরীত। মুকুন্দরাম যেমন স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দতার সহিত এই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহা পারেন নাই। অনেকে

স্থলে তাঁহার বিবরণ কৃত্রিম বলিয়া বিবেচিত হইবে। একটা উদাহরণ দ্বারা এই কথা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাউক। মুকুন্দরামের "চণ্ডীকাব্যে"র দুর্ব্বলার বেসাতি ও হিসাব-প্রদান রূপান্তরিত হইয়া ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দরে" হীরা মালিনীর বেসাতি ও হিসাব-দান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ব্বলার বেসাতি ও হিসাব-দান দ্বারা দুর্ব্বলার চরিত্রের এক অংশ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ইহা দুর্ব্বলার পক্ষে অস্বাভাবিক ত নহেই, পরন্তু তাহার চিত্রটি সম্পূর্ণ করিয়াছে; দুর্ব্বলা দাসী, দাসীর কার্য্য তাহার পক্ষে যতটা স্বাভাবিক হীরা মালিনীর পক্ষে বাজার-হাট করা ততটা নহে, তাহার বাজার করাটা এবং বেসাতির হিসাব-নিকাশ অনেকটা সখের ব্যাপার। অনেকটাই বা কেন বলি দেখিয়া মনে হয় যেন সবটাই সখের এবং সখের কবি এই ব্যাপারটাকে যে অন্য কোনও রূপ ভাবে দেখেন নাই, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁহার যমকের ছটা। দুর্ব্বলা তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া তাহারই অবশ্যদেয় হিসাব দিতেছে; হীরা মালিনী তাঁহার সখের বাজার সারিয়া সখ করিয়া হিসাব দেওয়ার ভাণ করিতেছে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, মুকুন্দরাম এই দুর্ব্বলার চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন কেবল দুর্ব্বলা দাসীকে; কিন্তু ভারতচন্দ্র হীরা মালিনীকে অবলম্বন করিয়া নিজের 'কারদানি' প্রকাশ করিবার প্রলোভন সম্বরণ

করিতে পারেন নাই। কোনও একজন সুসমালোচক ভারত-চন্দ্রকে তৎসৃষ্ট হীরামালিনীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। এইস্থলে তাহার যৌক্তিকতা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

তাই বলিয়া আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাঁহার সময়ের সমাজ একেবারেই প্রতিফলিত হয় নাই। কবির কাব্যে তৎসাময়িক সময়ের প্রতিচ্ছবি অল্পবিস্তর পড়িবেই পড়িবে। এইরূপ ছবি ভারতচন্দ্রের কাব্য মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু সেগুলি যেন বিক্ষিপ্তভাবে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া আছে; একটা কোনও চরিত্রের বা সমস্ত কাব্যের সম্পূর্ণতা সাধনের উপলক্ষে যে সেই সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে।

মুকুন্দরাম যাহা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সকলই চরিত্রসৃষ্টি ব্যপদেশে; তিনি নিজের অস্তিত্ব যতদূর সম্ভব গোপন করিয়া গিয়াছেন. তাঁহার কাব্যে নাট্যকলা অত্যন্ত পরিস্ফুট। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন তাহা কোনও একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজনবশতঃ অধিকাংশ স্থলেই কোনও চরিত্রের পুষ্টিসাধনোপলক্ষে তাঁহাকে যেন দেখাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমরা এই নাট্যকলার বিষয় পরে আরও কিছু বলিব, এখন মুকুন্দরাম যে সমাজের বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা একবার দেখিয়া লইব।

দীনেশবাবু কহিয়াছেন, "মুকুন্দরাম প্রথম শ্রেণীর চিত্রকর, কিন্তু তিনি যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দ্বিতীয়

শ্রেণীর।"* কথাটা যেন একটু অপরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। অন্তত দীনেশবাবু যে তুলনা দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের ঐ কথা বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। যাহা হউক কবিকঙ্কণের সময়ের বাঙ্গালী সমাজ দোষ-গুণযুক্তই ছিল, একথা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই, তবে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কি প্রথম শ্রেণীর তাহার বিচারে আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই যে, সে সময়ে বাঙ্গালীজাতি একেবারে মনুষ্যত্ববিবর্জ্জিত হয় নাই, আত্মসংযমহীন হইয়া পড়ে নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাস হারায় নাই। যিনি প্রত্নতত্ত্বান্বেষী, তিনি কবির ধর্ম্ম কোন যুগের ধর্ম্ম, তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমরা কেবল দেখি যে, ধর্ম্মই তখন প্রচলিত থাকুক, জনসাধারণ সেই ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিল। মা যা করেন তা ভালর জন্যই করেন, এই বিশ্বাস লোকের মনে প্রবল ছিল এবং সেইজন্য সুখে দুঃখে তাহারা মাতৃচরণে মতিহীন হইত না। আমরা দেখিতে পাইব যে, মুকুন্দরামের সমগ্র কাব্যে এই শক্তিপূজার মাহাত্ম্য-প্রচারই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুবর্ণসূত্রবৎ তত্রস্থ পরস্পর-অসংলগ্ন উপাখ্যানদ্বয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত ও সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালী যে তখন উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। মুকুন্দরামের অল্পপূর্ব্বেই বাঙ্গালায় প্রতাপাদিত্যের

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

অভ্যুত্থান হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত। ঐশী শক্তির অখণ্ড প্রতাপ স্বীকার করিয়াও বাঙ্গালী তখনও বলবীর্য্যবান ছিল। কালকেতু তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালী তখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় ছিল, বাণিজ্যার্থ অনায়াসে দেশ ছাড়িয়া বিদেশে গতায়াত করিত, সমুদ্র পার হইয়াও অপর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত, আদিত্যপুরাণের দোহাই দিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত না। সে সময় বাঙ্গালী নিতান্ত ভীরু হইয়া পড়ে নাই, তাহার প্রমাণ শ্রীমন্তের সিংহল-যাত্রা। কিন্তু সমাজে কতকগুলি কুপ্রথাও প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—তাহার মধ্যে প্রধান কৌলীন্যপ্রথা। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশক্তির যথেষ্ট অপচয় হইতেছিল। মূর্খ বিপ্রের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিল—কবি তাহাদের প্রতি একটু তীব্র কশাঘাত করিতে ছাড়েন নাই—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চাউলের বোচকা বাঁধে টান॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈল-কুপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি কেহ দেয় দালিবড়ি
গ্রাম বাটী আনন্দে সাঁতারি॥"

বাঙ্গালী চরিত্রে আর একটি দোষ প্রবেশ লাভ করিতেছিল

তাহা স্ত্রৈণতা। যদিও তখন ইহাদ্বারা বাঙ্গালী একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই, তথাপি ইহা বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, কতক পরিমাণে ইহার কুফল বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কালকেতু অতখানি বীর্য্য প্রকাশ করিয়া শেষে স্ত্রীর কথায় যে স্বচ্ছন্দে গৃহকোণে লুকাইল, ইহাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কবি "যথাদৃষ্ট তথালিখিত" করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল দোষ আসিয়া পড়িলেও তখন বাঙ্গালীর চরিত্রে একটি বিশেষ সদ্‌গুণ ছিল—সেই গুণ আত্মসংযম। মুকুন্দরামের কবিত্ব আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত; তাঁহার চরিত্র আত্ম-সংযমে গৌরবান্বিত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার হৃদয় ভক্তিধৌত অতএব সুখে বা দুঃখে অবিচলিত। এই চরিত্রবলে বাঙ্গালী তখনও বলীয়ান্ ছিল। সত্য বটে, মুসলমানের অদম্যপ্রতাপে বাঙ্গালীর উৎসাহ সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তখনও প্রতাপা-দিত্যের বা কেদার রায়ের অভ্যুত্থান একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাই। তখনও বাঙ্গালী দিল্লীশ্বরের প্রচণ্ড বিক্রমকে উল্ল-ঙ্ঘন করিবার সাহস রাখিত। তখনও সমাজে একজন সরল ধার্ম্মিকের পক্ষে অজাতিনির্ব্বিশেষে যথেষ্ট প্রতিপত্তি পাইবার সম্ভাবনা ছিল।

শিক্ষা-দীক্ষাদি সম্বন্ধেও সমাজ তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল। ধনীর সন্তানও গুরুগৃহে গিয়া রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা করিত—এ বিদ্যাশিক্ষা তখনও খাঁটি হিন্দুমতেই হইত; মুসলমান-রাজত্বের

প্রভাব তখনও এতটা প্রস্থত হয় নাই, যে ফারসী না শিখিলে চলিত না ; মুসলমানের সভ্যতা ও বিলাসিতা তখনও বাঙ্গালীকে অমানুষ করিয়া তোলে নাই। শ্রীমন্তের বিদ্যালাভের বিবরণ এইরূপ—

রঞ্জিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণবৃত্তি আর ব্যকরণ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনা নাহি অন্য মন॥
পড়িল কথক দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দ পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বার কুতুহল॥
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পরে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।
দিবানিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেতমুনি
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব॥
অব্যাহত বুদ্ধিগতি পড়ে দুই সপ্তশতী
পড়ে মুদ্রা মুঁরারি মালতী।
হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা-ভাস্বতী।
কাব্য প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবানিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্ন রাঘব রাম গুণে॥

স্ত্রীলোকেরাও পুরাণাদি কথা শিক্ষা করিতেন, ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে অনেক পৌরাণিক কথা শুনাইয়াছিলেন। লহনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় ভাগবত শুনিয়াছিলেন এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, খুল্লনা বিদ্যোৎসাহিনীও ছিলেন, কারণ তাঁহারই আদেশে ও আগ্রহে শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। ফলতঃ স্ত্রীজাতিই তখনকারও বঙ্গসমাজের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন, এখনও আছেন—তবে এখন অনেক স্থানেই অনেকটা বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছেন, তখন খাঁটি আর্য্যনারীই ছিলেন। স্বামীভক্তি, আত্মহীনতা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যপটুতারূপ সদ্‌গুণে ভূষিতা হইয়া তখনকার রমণী সমাজ সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পতনোন্মুখ বাঙ্গালী জাতির গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু সীতাসাবিত্রীর মত দুর্দ্দম নির্ভীকতা তাঁহাদের ছিল কি? বোধ হয় ছিল না, নচেৎ ফুল্লরা যুদ্ধোদ্যত স্বামীকে ঘরের কোণে লুকাইবার পরামর্শ দিলেন কেন? খুল্লনা শ্রীমন্তের ঐকান্তিক আগ্রহবশতঃ তাহাকে সিংহলযাত্রার অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, প্রথমে কিন্তু অনেক ওজর আপত্তি তুলিয়াছিলেন।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তখনকার সমাজে ব্রাহ্মণ অনেক পরিমাণে ব্রহ্মণ্যশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণ আর তেমন শান্ত দান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজয়ী দেবতুল্য মনুষ্য ছিল না। গুরুশিষ্যের সম্পর্ক অনেক পরিমাণে বিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ কবি জনার্দ্দন ওঝার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা হইতেই এ কথা সাব্যস্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-সমাজের পতনে পবিত্রতা-

রূপিনী নারীজাতিরও কিছু পতন হইয়াছিল; আদর্শহীনতা তাঁহাদের মধ্যেও ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল, নচেৎ পতি-নিন্দা শ্রবণে কলুষিত-দেহত্যাগকারিণী সতী যে দেশের নারীর আদর্শ, সেই দেশের নারীর মুখে পতিনিন্দা বসাইতে কবি কুণ্ঠিত হইলেন না কেন? সৌভাগ্যের বিষয় তথনও কিন্তু স্ত্রীজাতি আত্মসংযম হারান নাই, দারিদ্র্য বা অন্য দুঃখকে আপনাদের সহিষ্ণুতা লোপ করিতে দেন নাই।

কিন্তু কুসংস্কার স্ত্রীজাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন সমস্ত জগতই বোধ হয় এমনি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সকল দেশের স্ত্রীলোকেরাই তখন স্বামী-বশীকরণের ঔষধ পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকিত, লীলাবতী লহনাকে যে পতিবশীকরণের ঔষধ বলিয়া দিয়াছিল তাহা পড়িলেই সেই সময়কার ইংরাজ কবি মিডলটনের 'Love Philter'এর কথা মনে পড়িবে।

1st Witch—Here is the blood of a bat
Hecat—Put in that O pun in that
2nd Witch—Here's Libbord's on
Hecat—Put in again
1st Witch—The Jina of toad the oil of addres
2nd Witch—Those will make the younker madder*

Hecatএর ব্যবস্থা।

লীলাবতীর Prescription (ঔষধের ব্যবস্থা)

* Middleton—The Witch. Act v. Sec. II.

"ছিনা জোক আর শ্বেত কাকের শোণিত।
কালিয়া কুকুর মারি আন তার পিত্ত॥"

এইরূপ দোষে গুণে মাখামাখি হইয়াও তখনকার রমণীগণের চরিত্র নিতান্ত অপ্রশংসনীয় ছিল না, এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

মুকুন্দরামের সমালোচনায় তাঁহার সমসাময়িক সমাজের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া নিতান্ত অবান্তর বিষয়ে সময় ক্ষেপ করা নহে, তাহার প্রমাণার্থ অধিক যুক্তিতর্কের আবশ্যক করে না। কবিকে বুঝিতে হইলে, কাব্যের চরিত্রগুলিকে বুঝিতে হইলে সে সময়কার সমাজের অবস্থা জানা বড়ই আবশ্যক। সৌভাগ্যবশতঃ মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা তৎকালীন সমাজের একটা অবিকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই। আমরা এতক্ষণ তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে সময়কার আচার ব্যবহার প্রভৃতি বাহ্য অঙ্গগুলিও কবির কাব্যে পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কি কি আচার-পদ্ধতি ছিল, কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়াইয়া যায় নাই। বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা, বঙ্গের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত, বঙ্গের জ্ঞান, উদ্যম, উৎসাহ, সকলই এই কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। কবির বিশাল চিত্রপটে, ছোট বড়, ভাল মন্দ, সকল প্রকার দৃশ্যের একত্র সমাবেশ একটি সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে; বহুদিনের পুরাতন একটি সমাজ যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমাদের নয়নের সমক্ষে দাঁড়াইয়াছে,

কোনও ঐতিহাসিক কি ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী করিতে পারেন? সত্য বটে, ইহাতে কোন রাজা কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কে কবে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এ সকল সংবাদ নাই, কিন্তু যাহাদের লইয়া ইতিহাস, তাহাদিগকে অর্থাৎ তখনকার মনুষ্যগুলিকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি, ইহা অপেক্ষা কোন্ ইতিহাস অধিক মূল্যবান সংবাদ দিয়াছে? মুকুন্দরামের পুস্তক ঐতিহাসিক গবেষণাপূর্ণ নহে, তাহা কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র; কিন্তু এই কাল্পনিক কাহিনী হইতে আমরা যে সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারি তথাকথিত ইতিহাস হইতে তাহা পারি কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

"The fiction carries a greater amount of truth in solution than the volume which purports to be all true. Out of the fictitious book I get the expression of the life of the time, of the manners, of the movement, the dress, the pleasures, the laughter, the ridicules of the Society. The old times live again......can the heaviest historian do more for me?" *

কবিকঙ্কণে নিপুণ তুলিকার স্পর্শে যে সমাজের চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার ভিতর হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা এই অবসরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে, কবিকঙ্কণ কোন একটা গভীর দার্শনিক উদ্দেশ্য লইয়া, বা কোনও ধর্ম্ম-

* Thackeray—English Humourists.

(হস্তলিখিত)

প্রচারকের আসন গ্রহণ করিয়া এ সকল তথ্য পাঠকের গোচর করেন নাই। তাঁহার কাব্যের উপাখ্যান সম্পূর্ণ করিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তিনি করিয়াছেন, কথাগুলি যেন আপনা হইতে আসিয়া পড়িয়াছে—কিন্তু তাহা হইতেই আমরা তাঁহার সময়কার ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে পারি। আমরা জানিতে পারি যে, তখন বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈবের বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল, বহু বৎসর পরে ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

শ্যাম শ্যামাতনু, মহাকাল কানু
একই সকলি বুঝিতে নারি।

অশিক্ষিত কালকেতু ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে গাহিয়াছিলেন—

তুমি সত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি তমঃগুণ
আরাধনে হরি হর তুমি তিন জন॥

মুকুন্দরাম শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী; শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মশিক্ষায় তখন বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, মহাপ্রেমিকের প্রেম-বন্যায় সুধন্য বাঙ্গালাদেশ সর্ব্বতোভাবে সিক্ত হইয়াছিল। কবি চণ্ডীর উপাসক হইলেও তাঁহার হৃদয় এই অমৃতময় প্রেমরসে আপ্লুত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট পরিচয় তাঁহার কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার শ্রীমন্ত ও তাহার সাথী বালকগণ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিত; নিত্যানন্দের জীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার বাল্যকালেও ঐরূপ ক্রীড়া তাঁহার প্রিয় ছিল

এবং মহাপ্রভুর জীবনেও এইরূপ আবেশ প্রায়ই দেখা যাইত। জীবে দয়া মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা ; মুকুন্দরামও সেই শিক্ষা দিয়াছেন ঃ—

শুন রে অবোধ ব্যাধ, কি তোর জীবনে সাধ
কেন কর প্রাণী বধ পাপ।
অধর্ম্ম করিয়া নিত্য, পোষ বন্ধু দারাপত্য
পরলোকে পাবে বড় তাপ ॥

হরিনাম-মহাত্ম্য-প্রচারও চণ্ডীকাব্যে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার যে ইষ্টদেবতাতেই নিষ্ঠা থাকুক, বোধ হয় অধিকাংশ লোকেই ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ের সহিত আস্থাবান্ ছিল। লোকের সেই আস্থা প্রকাশ করিবার সময়ই ধর্ম্মের চিত্র কবি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ধর্ম্মে বিশ্বাসের ফলে কতকগুলি সদ্‌গুণ তখনকার মনুষ্যের চরিত্রে বিরাজমান ছিল, তাহা আমরা বলিয়াছি। তাহার প্রথম আত্মসংযম। অশিক্ষিত ব্যাধ কালকেতুর ইন্দ্রিয়-সংযম যদি আজিকার দিনে আমরা পাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইত।

"পর স্ত্রীরে দেখি আমি নিদয়া জননী।"

একটি ব্যাধের হৃদয়ে যে সমাজে এমন সুন্দর, এমন উচ্চ ভাব জাগিতে পারে, সে সমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর কি তৃতীয় শ্রেণীর তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমাদিগকে কালকেতুর অপূর্ব্ব আত্মসংযমের ইতিহাসটি স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে। একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী উপযাচিকা হইয়া তাহার গৃহে

উপস্থিত, সে তাহাই জানে; কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীর লোভ সেই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যাধযুবক অনায়াসে সম্বরণ করিয়া নিজের যে অপূর্ব্ব বশিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আজকালকার অনেক উচ্চভাষী উচ্চশিক্ষাদর্পিত পুরাতনের প্রতি ভ্রূকুঞ্চনকারী যুবকবৃন্দের শিক্ষার স্থল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি সুন্দর গুণ সেই অশিক্ষিত ব্যাধের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল—তাহা তাহার নম্রতা অহঙ্কারের অভাব। আমরা যদি দৈবাৎ একটা ভাল কার্য্য করিয়া ফেলি, তবে তাহার প্রকাশমানসে চতুর্দ্দিকে ঢাক বাজাইয়া বেড়াই, এবং অন্যান্য লোককে অতিশয় কৃপার চক্ষে দেখিয়া থাকি এবং "Principle" "duty" প্রভৃতি হাল আমদানি কথার শ্রাদ্ধ করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলি। কিন্তু কালকেতু এমন দুরুহ আত্ম-বশীকরণ দ্বারাও গর্ব্বিত হইল না; এততেও সে বুঝিতে পারিল না যে, কেন সে কৃপাময়ীর কৃপালাভ করিয়াছে।

"হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আইলে পার্ব্বতি॥"

আমরা মুকুন্দরামের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার বিষয় বলিবার সময় কালকেতুর চরিত্র বিশেষরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব, এখন অন্য কথা বলিবার সময়।

আমরা তখনকার সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের ফলাফল বিচার করিতেছিলাম। তাহার দুই একটী ফল দেখাইয়াছি, আরও কিছু দেখাইতে ইচ্ছা করি। কবিকঙ্কণ আমাদের জন্য কত

অমূল্য রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের দেখাইবার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মে সরল বিশ্বাস হেতু, মায়ের বিধান সর্ব্বদা মঙ্গল-ময়; এই ধারণা তখনকার স্ত্রীলোকের চিত্তেও স্ফুরিত হইত, এবং সেই ধারণা হইতে চিত্তে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সঞ্চার লাভ করিয়া তখনকার লোকে দুঃখ-দারিদ্র্য শোক-কষ্ট অনেকটা অকাতরে সহ্য করিতে পারিত। তাই বলিয়া যে কেহ কাঁদিত না তাহা নহে, যে মানুষ কাঁদিতে জানে না সে মানুষ বোধ হয় মানুষই নয়। কিন্তু কাঁদিত বলিয়া তাহারা মায়ের বিচারে ভক্তিহীন হইত না, অথবা নিতান্ত মোহপরবশ হইয়া মাকে ভুলিত না। তাই পুত্রবিরহিতা কাতরা খুল্লনা মাকে বলিতে পারিয়াছিল—

সেই ছিরা দিয়াছ আপনি
হাথে তুলে দিয়া নিধি পুন কেড়ে লহ যদি
তবে কি করিতে পারি আমি ॥

আমিত্বভাব আজকাল যেমন প্রবল, তখন তেমন ছিল না, আমার আমার করিয়া যাহারা হাহাকার করিত, তাহারা তখন একটু নিন্দার্হ ছিল বলিয়া মনে হয়।

"জ্ঞান কন অভয়া সাধুরে প্রিয় ভাসে।
মোর মোর বলিতে অবনী দেবী হাসে ॥"

ইহার ফলে মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ—

"দেহ যদি গজতলে নিবারিতে পারি।
লভ্য অপচয়ের ভাগী হন মহেশ্বরী ॥

বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ॥"

ইহাই ভক্তের আত্মসমর্পণ।

ইহার ফলে কি বাঙ্গালী-চরিত্রে কাপুরুষত্ব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল? অনেকে মনে করেন যে,দেবতার উপর আত্যন্তিক নির্ভরের দ্বারা বাঙ্গালী অনেক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিল, হয় তো সে কথা সত্য; সাংসারিক কার্য্যে অনেক সময় আত্ম-নির্ভর অশেষ উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে আত্ম-নির্ভর ভগবানের উপর নির্ভরের সহিত মিলিত থাকিলেই মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হয়। কবিকঙ্কণ পুরুষকার সম্বন্ধেও বিশ্বাসবান ছিলেন—

"সুবুদ্ধি পুরুষকারে দৈব কি লঙ্ঘিতে পারে॥"

কিন্তু তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, পুরুষকার সত্ত্বেও দৈব-দোষে অনেক সময় লোকে বুদ্ধি হারাইয়া ফেলে, তাই যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করিয়াও কালকেতু স্ত্রীর কথায় ঘরের কোণে লুকাইল। বাঙ্গালী তখনও একেবারে নির্জ্জীব বা পুরুষকারহীন হয় নাই,তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণা হইতেও প্রমাণ হইতেছে।

এই উপলক্ষে আমরা মুকুন্দরামের সময়কার রাজনৈতিক অবস্থাও দেখিয়া লইবার বাসনা করি। মুকুন্দরাম আকবরের রাজত্বের শেষকালে ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরম্ভে জীবিত ছিলেন বোধ হয়। তিনি রাজা মানসিংহের প্রশংসা করিতেন।

রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়কে দমন করিয়া বঙ্গের সুবাদার হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পূর্ব্বেই অথবা সেই সময়েই এই দুই বীরপুরুষ বঙ্গগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত উঠিয়াছিলেন, এবং নির্ভয়চিত্তে প্রচণ্ড মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কতক দিনের জন্য বঙ্গদেশকে হিন্দু রাজার শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন। বঙ্গে তখনও বারভূঞার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য নিজ অধ্যবসায় ও বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক বারভূঞার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন বঙ্গের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। কালকেতুর রাজ্যপ্রাপ্তি কি এই ঐতিহাসিক ঘটনারই কবিকল্পিত প্রতিচ্ছবি নহে?

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হইল রাজা।
আর যত ভূঞা রাজা সভে করে পূজা॥
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
পরাজয় পায়া রাজাগণ দেয় কর॥

আমরা জানি যে, সে সময় বঙ্গে সেই মহাবীর একটা মহাশক্তির ধারা ছুটাইয়াছিলেন; বৈষ্ণবগণের শান্তিময়ী প্রকৃতি বশাভূত বাঙ্গালীকে আর একবার শক্তির উপাসনায় বদ্ধপরিকর করিয়াছিলেন। কালকেতুর উপাস্য দেবতাও চণ্ডী, কবি মুকুন্দরামেরও আরাধ্য দেবতা চণ্ডী ও চণ্ডীর মাহাত্ম্যপ্রকাশই তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহার কাব্যের চরম লক্ষ্য, তাঁহার কাব্য যে লক্ষ্যহীন একথা আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। তাঁহার সময়ে যে মহাশক্তির উদ্বোধন হইয়াছিল,

এই কালকেতুর উপাখ্যানে স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ইহার ভিতর হইতেই আমরা তখনকার অনেক রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। কেমন করিয়া সকল নূতন নগরেই মুসলমানগণ আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা জানিতে পারি, কেমন করিয়া নিয়োগী চৌধুরীগণ তালুক মুলুক করিতেছিল তাহাও জানিতে পারি। কত হীনাবস্থ ব্যক্তি তখন নিজের উদ্যমবলে, বা বীর্য্যবলে হীনাবস্থা হইতে সমৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইত। পশুযুদ্ধে যে একটা রাজনৈতিক ঘটনার ছায়াপাত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দীনেশবাবু যে ভাবে সেটিকে বুঝিয়াছেন আমি ঠিক সে ভাবে বুঝি না। আমার বিবেচনায় কালকেতুর অভ্যুত্থানে প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থানের চিত্র দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহার অদ্ভুত বীর্য্যের কাছে অন্যান্য ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর মস্তকাবনমন এই পশুযুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কালকেতুর দ্বারা চণ্ডীর পূজা মর্ত্ত্যে প্রচারিত হইয়াছিল ইহার একটা তাৎপর্য্য আছে। সে তাৎপর্য্য কি? বৈষ্ণবধর্ম্ম-অনুপ্রাণিত শিথিলবীর্য্য বঙ্গের সন্তানগণের মধ্যে শক্তিপূজার প্রচার প্রতাপাদিত্যই করিয়াছিলেন, অতএব আমি মনে করি যে, কালকেতু ও পশুদিগের মধ্যে যুদ্ধে পশুদিগের পরাজয়ে ঐ ঐতিহাসিক ঘটনাই কবি আভাসে জানাইয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই যে, এই পশুগুলি বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া বৈষ্ণবের মত অহিংসা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিল—

"বায়েস খাইবে মৃগ কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে ॥
অবিরোধে দোঁহে থাক শশারু খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ ॥"

পশুরাজ্যের বর্ণনা যাহা আমরা দেখিতে পাই তাহা একটা ভূঞা রাজার রাজ্যের ছায়াস্বরূপ। যাহাই হউক ইহা যে, তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার এক অংশের চিত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাঙ্গলাকে প্রথম মুসলমান রাজত্বভুক্ত করেন মানসিংহ, তৎপূর্ব্বে নামে মুসলমান রাজ্যান্তর্গত থাকিলেও, বঙ্গদেশ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। তাই আমরা চণ্ডীকাব্যে মুসলমানের কথা বেশী শুনিতে পাই না। কিন্তু মুসলমানের অত্যাচার যে আরম্ভ হয় নাই তাহা নহে—কবির নিজের জীবনের ইতিহাসেই সে অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। বারভূঞাগণের মধ্যেই কতকগুলি মুসলমান ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও মুসলমান সভ্যতায় দেশ তখনও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই ইহা নিশ্চিত। তখনও ধূতি-চাদরের আদর ছিল। সকলের উপর প্রজার একটি মহৎ সুখ ছিল—প্রজার অন্নের সংস্থান ছিল।

ভারতচন্দ্রের সময়ও প্রজার অন্নকষ্ট দেখা দেয় নাই, দেশে তখনও অন্নের যথেষ্ট সংস্থান ছিল। রাজনৈতিক অবস্থারও যে সবিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বলা যায় না। প্রকৃত শাসনভার দেশের ভূম্যধিকারিগণের হস্তেই ন্যস্ত ছিল, তাঁহারা

নবাবকে কর দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন। কিন্তু মুকুন্দরামের সময়কার বাঙ্গালীতে আর ভারতচন্দ্রের সময়কার বাঙ্গালীতে বিস্তর প্রভেদ হইয়া গিয়াছিল; "সম্ভ্রান্তঘরের মধ্যে মুসলমানের বিলাসিতা হিন্দু সংযমের স্থান অধিকার করিয়াছে সুতরাং তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র কিছু উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ; নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও চরিত্রহীন, মাৎসর্য্যসম্পন্ন, ধর্ম্মের অবনত মূর্ত্তির উপাসক।"*

ভারতচন্দ্রের কাব্যেও আমরা তাঁহার সময়ের সমাজের দেশের ধর্ম্মকথার ও রাজনৈতিক অবস্থার বিলক্ষণ পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই যে "বঙ্গের সামাজিক প্রথারও মুসলমান সভ্যতা হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালী তখন ভাষায় ও ব্যবহারে অর্দ্ধ মুসলমান। পারস্য তখন রাজভাষা—এখন ইংরাজীর যেমন কদর, পারসীও তখন সেইরূপ। স্বয়ং কবিকেও কেবলমাত্র সংস্কৃত শিখিয়া প্রথমে হতাদর হইতে হইয়াছিল।"*

ভারতচন্দ্র নিজে নিজের বিদ্যার পরিচয় করিয়াছেন,—

"মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেই মত জানিবারে পারি।

অন্নদা কবির গুণপণা বর্ণনকালে কহিয়াছেন ঃ—

"ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী॥"

বিদ্যাশিক্ষার মত সাজ-সজ্জারও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর পরিচ্ছদে হিন্দু ও মুসলমানের অপূর্ব্ব খিচুড়ি, কর্ণে কুণ্ডল বা বীরবৌলি, পরিধানে বিলাতী খেসাভ, মাথায় জরকশী চীরা (পাগ্‌ড়ি ?) হীরকময় মাণিক কলসী তোরা পরিয়া, গলে ধুকধুকি দোলাইয়া, খড়্‌গ, চর্ম্ম ও 'লেজা তীর খঞ্জর কমোখে' সুশোভিত হইয়া ঘোড়ার ছোনায় (গলায় ?) রত্নভরা খুশীপুঁথি লইয়া কবি তাঁহার সুন্দরকে বর্দ্ধমান প্রেরণ করিয়াছেন—এ পরিচ্ছদে ভারতের ভাষার মত সংস্কৃত পারস্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন। হিন্দুর রাজ-সভায়ও তদ্রূপ হইয়াছে, আরজাবগী নকীব মুন্সী কোতোয়ালে ব্রাহ্মণ বন্দী বৈদ্যরাজে রাজা বীরসিংহের সভা সমুজ্জল। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা নাকে বেশর, হাতে শাঁখা কঙ্কণ ও তাড়, সীমন্তে সীথি গলায় হীরার পলার মালা পরিয়া রক্ত বা নীলবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিয়া পাটের মশারির ভিতর শয়ন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। রন্ধনে তাঁহারা দ্রৌপদী ছিলেন—অন্যান্য গৃহকর্ম্মের মধ্যে রন্ধনই তাঁহাদের প্রধান সার্টিফিকেট ছিল—নবীনাদের যেমন আজকাল উলবুনা ও পিয়ানো বাজান হইয়াছে—"*

আমরা যে "পোষাক" দেখিলাম তাহা "দরবেরে" পোষাক, ঘরে আসিয়া বাঙ্গালী এই দরবেরে পোষাক ছাড়িয়া ধুতি আর চাদর পরিয়া পান খাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। এই প্রকারে

* গ্রাম্য সাহিত্য।

বাঙ্গালীর চরিত্রেও একটা দ্বিত্বভাব আসিয়া পড়িয়াছিল— "দরবেরে" আর "ঘরওয়া"। বাঙ্গালী আর তেমন সরল ধার্ম্মিক উৎসাহশীল কর্ম্মপটু ছিল না, তাহাদের খেলা-ধূলায়, আমোদ-আহ্লাদে একটা বিপ্লবময় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। "আগে লোকে ভারত পুরাণাদি শুনিয়া, হরিনাম শ্রবণ করিয়া, সঙ্কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিয়া সময়ক্ষেপ করিত, এখন লোকে "বুলবুলি মোরগের লড়াই দেখিয়া, তীর চালাইয়া, লাঠি খেলিয়া, উড়াপাক ঢাল খেলা ও রায়বাঁশ লোফা ও মল্লদের মালসাট দেখিয়া নদীয়া শান্তিপুর হইতে সমাগত অশ্রাব্য খেঁউড় শুনিয়া ভব্যতা ও সময়ের আদ্যকৃত্য করিত।"

বাঙ্গালীর বুদ্ধিও দরবেরে ও ঘরওয়া এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর "মাথা" চিরকালই বাঙ্গালীর "মাথা"— কিন্তু তখন আর বাঙ্গালার মাথা সরলভাবে খেখিত না। ঘরওয়া বুদ্ধি লইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যার উৎসাহদান করিতেন, সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সময় কাটাইতেন। আর "দরবেরে" বুদ্ধি লইয়া পিতৃব্যকে ঠকাইয়া কৌশলে রাজ্য হস্তগত করিতেন, আলিবর্দ্দিকে অনুর্ব্বর ভুমি দেখাইয়া রাজকর মাপ করাইতেন, রাজবল্লভের হাতে পৈতা জড়াইয়া ৫ লক্ষ টাকা ফাঁকি দিবার ব্যবস্থা করিতেন এবং নিমকহারাম মীরজাফরের সহিত মিলিত হইয়া নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার কৌশল উদ্‌ভাবন করিতেন। রাজনৈতিক কূটতার প্রশ্রয় বাড়িয়াছিল বলিয়া সোজা রাস্তায় চলা অনেকে ছাড়িয়া

দিয়াছিলেন। অধিকাংশ লোকই নৈতিক চরিত্র হারাইয়া, আত্মসংযম হারাইয়া তুচ্ছ ইন্দ্রিয়পরতায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। কবির কাব্যে যতগুলি চরিত্র আছে সকলই ইন্দ্রিয়-সুখমুগ্ধ বিলাসপ্রিয় স্ত্রীচালিত জীব। আমরা বলিয়াছি যে, মুকুন্দরামের সময় হইতেই বাঙ্গালার চরিত্রে স্ত্রৈণতা-দোষ স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—এই দোষ ভারতচন্দ্রের সময় একটা শক্ত রোগে দাঁড়াইয়াছিল। বড় হইতে ছোট সকলেই এই রোগ-গ্রস্ত। তাহার উপর কাপুরুষতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং উদ্যম-হীনতা প্রভৃতি অনেক দোষ বাঙ্গালীর চরিত্রে আসিয়া জুটিয়াছিল। কবির ধূমকেতুর চরিত্র ও দাস বাসুর চরিত্রে বাঙ্গালী চরিত্রের অনেক কথা প্রকাশিত। ধূমকেতু নিজে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু অন্যের উপর হাঁক-ডাকে ও অত্যাচারে বিশেষ পটু; পঁচিশ জনের সাহায্যে একজন মানুষকে বন্দী করিয়া তাহার যে আনন্দ কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হাসিব কি কাঁদিব তাহা ঠিক করিতে পারি না; সে দৃশ্য অনেক পরিমাণে আজকালকার পুলিসপুঙ্গবগণের বীরত্ব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় দাসু ও বাসুর চরিত্র আরও অদ্ভুত; তাহারা আসিয়াছে প্রভুর সহিত প্রভুর উন্নতিতে কিছু লাভ করিতে। যেই প্রভু বিপদাপন্ন হইলেন অমনি তাহারা বিপন্ন প্রভুকে ছাড়িয়া পলাইবার পরামর্শ করিতেছে।

দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।

বিস্তর চাকুরী পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥

কি সুন্দর প্রভুভক্তি। দেশ ছাড়িয়া বিদেশে উন্নতি-মানসে আসিয়াছেন প্রভুর একি কম অপরাধ?

হেদে বামনের ছেলে, আগু পিছু নাহি চলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতসার দেয়ানে আসিতে ॥

তারপর সেই স্ত্রৈণতা, সেই ঘরের কোণের প্রতি বাঙ্গালীর যে আমাদিগের চির-পরিচিত অনুরক্তি তাহাও উহাদিগের চরিত্রে বেশ ফুটিয়াছে:—

যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামনের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটী খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥
দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বাড়া কেবা আছে দুখী ॥

পুরুষ-চরিত্রের সহিত স্ত্রী-চরিত্রেরও অবনতি ঘটীয়াছিল। কিন্তু সে অবনতি অত দুর্দ্দিনেও বড় লোকের ঘর ভিন্ন অন্য কোথাও বড় একটা বর্ত্তিয়েছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যার

চরিত্র লইয়া তখনকার স্ত্রী-চরিত্র বিচার করা ঠিক সঙ্গত নহে। যদি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য কবির মৌলিক রচনা হইত, তাহা হইলে বিদ্যা-চরিত্র তখনকার বড় ঘরের মেয়ের চরিত্র প্রতিবিম্বিত করিতেছে সে কথার সারবত্তা মানিতাম; কিন্তু বিদ্যাসুন্দর কাব্যে কবি পরহস্তাগত কাষ্ঠখণ্ডে কারুকার্য্যমাত্র করিয়াছেন, অতএব ইহা হইতে কবির কোনও গভীর উদ্দেশ্য কল্পনা করা ন্যায়সঙ্গত নহে। কবি কি সমাজের প্রতি প্রচ্ছন্ন হাস্য করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন? রবি বাবু লিখিয়াছেন—"বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন।"*

বিদ্যাসুন্দর কাব্য যদি যথার্থই "অত্যাচারী সমাজের প্রতি মানবপ্রকৃতি সুনিপুণ পরিহাস" হয়, তাহা হইলে সেই পরিহাস করিবার নিন্দা বা প্রশংসা যাহাই বলুন ভারতচন্দ্রের প্রাপ্য নহে, কারণ ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেকে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র কেবল পিত্তল ঝালাইয়া সোণার মত দেখিতে সুন্দর করিয়াছেন—কিন্তু বস্তুটা পিত্তল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিদ্যাসুন্দর হইতে যদি কিছু জানা যায় তো তাহা সমাজের বিকৃতরুচি। যে সমাজে এমন কাব্যের আদর হইত, তাহার রুচি নিতান্ত কলুষিত হইয়াছিল

* গ্রাম্য সাহিত্য।

সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যার চরিত্র সে সময়কার সমস্ত স্ত্রীজাতির চরিত্রের পরিচায়ক বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। অধিকাংশ সমালোচক ভারতচন্দ্রের সমালোচনা করিবার সময় তাঁহার "বিদ্যাসুন্দর" ভিন্ন অন্য কাব্যের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। বিদ্যা রাজা-রাজরার মেয়ে তাঁহার চরিত্রের মাপকাটিতে গৃহস্থালীর চরিত্র মাপ করিলে চলিবে কেন? স্বীকার করি যে, মুসলমান সভ্যতার বিষময় ফলে তখন স্ত্রী-চরিত্রও কতক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তো বঙ্গবধূ আজকালকার মত অগ্নিস্পর্শে গলিয়া যাইতেন না; তখনও ভবানন্দ রাজগি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার পরও তাঁহার পত্নী স্বহস্তে পাক করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সমাজে তখনও রাণী ভবানীর সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই, তখনও বঙ্গললনা হাসিতে হাসিতে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না।

"চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।"

ভারতচন্দ্র তো এই কথাই লিখিয়াছেন, তবে সেটি ভুলিয়া গিয়া কেবল বিদ্যা বিদ্যা করিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত হইব কেন?

তাই বলিতেছিলাম যে, রুচি যতই বিকৃত হৌক, স্ত্রীচরিত্রের আদর্শ যতই খর্ব্ব হউক, সকল স্ত্রীলোকই যে বিদ্যার মত 'বেহায়া' হইয়াছিল, ভারতচন্দ্রের সময়ের ঘাড়ে সে দোষটা

না চাপাইলে কি চলে না ? অনেকে বলিবেন যে তবে নারীগণের পতিনিন্দা ভারতচন্দ্রে স্থান পাইল কেন ? পতিনিন্দা মুকুন্দরামেও আছে, মুকুন্দরামে যাহা আছে ভারতচন্দ্র তাহা নানা উপায়ে নিজের রচনা মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন ; এই পতিনিন্দা ব্যাপারটাও সেই অনুকরণ-প্রবণতার ফল নহে ইহা আমি বলিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ এই পতিনিন্দার ভিতর হইতে যে আমরা যথার্থই রমণীগণের বাক্য শুনিতে পাই তাহা নহে—মুকুন্দরামের পতিনিন্দায় একটি বাস্তব বেদনার ছায়াপাত আছে কিন্তু ভারতচন্দ্রের পতিনিন্দায় সে সময়কার রমণীগণের আর্ত্তধ্বনি নাই, কবির রসিকতা ও বিদ্রূপ করিবার ক্ষমতার পরিচয় আছে, আর আছে কবির কুৎসিত আদিরস-প্রিয়তার বীভৎস বিকাশ। "সাবাস হুজুগ আজব সহরে" কবি হেমচন্দ্র যে রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নারীগণের পতিনিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এই পতিনিন্দারূপ সুদীর্ঘপদ্যে ভারতচন্দ্রও অনেকটা সেই হাস্যরসকেই অবলম্বন করিয়াছেন। এ পরিহাস-বন্যায় উকীল, পুরোহিত, বক্‌সী, মুন্‌সী, কেহই বাদ যান নাই, সকলেই সেই স্রোতের মুখে ভাসিয়া গিয়াছেন। যথার্থ নিম্নপ্রবৃত্তির পরিচয় সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের চিত্তবিকৃতিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়টিও ভারতচন্দ্রের নিজের মৌলিক নহে, রামপ্রসাদেও ইহার অস্তিত্ব আছে। স্ত্রীচরিত্র যে অবনত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ হীরার মত চরিত্রশালিনী স্ত্রীলোকের

আম্‌দানী। কিন্তু সমগ্র কাব্য হইতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাতে মনে হয় যে, এই সকল স্ত্রীলোকের কারবার বড়ঘরেই পর্য্যবসিত ছিল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দেখিতে পাওয়া যায় তখন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই একাধিক বিবাহ করিতেন। কবি বলিয়াছেন, এ না হইলে স্ত্রীর আদর পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতে যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হইত, তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের যথেষ্ট ক্ষতি হইত, এবং সেই নিত্য কলহময় গৃহ হইতে দেবী অন্নদা যে পলাইবার সুযোগ খুঁজিবেন তাহারই বা আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মেও বিদ্বেষ ও হিংসাভাব প্রবেশ করিয়াছিল শুনিতে পাওয়া যায়, কবির আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র শাক্ত ছিলেন ও চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। কবির সৃষ্ট ব্যাস-চরিত্রে কি কৃষ্ণচন্দ্রের এই ভ্রম দূর করিবার প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে? তা যাহা হউক কিন্তু ব্যাস-চরিত্র ব্যপদেশে কবি এবম্বিধ সাম্প্রদায়িক কলহের মীমাংসাও সম্প্রাদায়গণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য ব্যাসের চরিত্র কবির দেবচরিত্রের মত অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়াছে, কিন্তু এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের চেষ্টা কবির সহৃদয়তার পরিচায়ক। এতদ্ভিন্ন তখন মুসললান ও হিন্দুর মধ্যেও বিলক্ষণ ধর্ম্মযুদ্ধ চলিত, কবি সহজ কথায় তাহারও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দুরূহ বিষয় সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা ভারতচন্দ্রের বেশ ছিল।

"হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক, নহে দুই মত॥

* * * *

মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥"

জাহাঙ্গীরের হিন্দুনিন্দা ও ভবানন্দের উত্তরে আমরা দুইটি কথা জানিতে পারি। প্রথম হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিদ্বেষ ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নির্ভীকতা, অমন পতিতাবস্থায় ও ব্রাহ্মণ নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী। ভারতচন্দ্রের সমগ্র কাব্যমধ্যে এই অংশটুকু উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত।

ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভুমে মাথা দিয়া॥

ভবানন্দের নির্ভীক উত্তরের ফলে তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা, ইহাতেও তখনকার দিনের একটা ছায়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। উদ্ধতপ্রকৃতি ও বিবেকহীন যুবক নবাব সিরাজদ্দৌলা নিজের অবিমৃশ্যকারিতার প্রশ্রয় পাইয়া যে যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল তাহারই ফলে কয়েক বৎসর পরেই পলাসীক্ষেত্রে তাহার অধঃপতন।

মাঝে মাঝে এইরূপ অত্যাচার ঘটিলেও তখন পর্য্যন্ত প্রজাগণের সুখ ছিল, অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া প্রজাগণকে আত্মহারা হইতে হয় নাই। তাহারা জমীদারকে খজ্‌না দিয়া নিশ্চিন্তমনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, ঘরে ঘরে দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইত ; অতিথি কখনও গৃহস্থের ঘরে আসিয়া অসৎকৃত হইয়া ফিরিয়া যাইত না, অতিথি সৎকার করিবার যাহার ক্ষমতা হইত না সে আপনাকে বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিত। পিতামাতার প্রতি ভক্তিও তখন প্রবল ছিল। এখনকার মত অন্ধ স্বাধীনতায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া লোকে কেবল নিজের জন্য ভাবিতে শিখে নাই, বাপ মাকে তুচ্ছ করিয়া পত্নীভক্ত হইতে শিখে নাই। দেশবাসীর মনে বাঙ্গালীর চক্ষে—

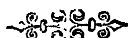
সপ্তদীপ মধ্যে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশ গঙ্গার অধিষ্ঠান॥

কতকটা সুখের সময়, বিলাসময় হইয়াও বাঙ্গালী তখনও বীর্য্যহীন নহে। মুসলমান ও হিন্দু বহুদিনের একত্র সহবাসে অনেকটা ভাই ভাইয়ের মত হইয়াছে।

কিন্তু জাতীয় চরিত্রের এই সুখ-স্বচ্ছন্দতা ও অলীক স্বাধীনতার ফলে একটা অবসাদ, একটা অলস বিলাসিতা ও অকর্ম্মণ্যতা আসিয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম্মে উচ্ছৃঙ্খলতা ও জীবনে

সংযমহীনতা ও বুদ্ধিতে কূটতা মিশিয়াছিল; বাঙ্গালী উচ্চাভিলাষ ও উচ্চনীতি হারাইতে বসিয়াছিল বা হারাইয়াছিল! এই জাতীয় চরিত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যে—নিজেরই মত বিলাস-বিভ্রমময় চটুল চারু ছন্দোবন্দে উচ্ছৃঙ্খল হাস্যজড়িত হইয়া কতক কৃত্রিম ও কতক বিশুদ্ধভাবে, কখনও ঘরোয়া কখনও দরবারী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে—এ অভিব্যক্তি অধিকাংশস্থলেই আভাষে—ইহাতে সম্পূর্ণতা নাই, আত্ম-প্রকাশের আবেগই নাই, সব সময় যে নির্ভীক সত্যানুরাগ আছে তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। মুকুন্দরামের ও ভারতচন্দ্রের সমাজ-চিত্রে এই প্রভেদ।

আমরা এই প্রবন্ধের এতদংশে অনেকটা প্রত্নতত্ত্ববিদের কার্য্য করিয়াছি, কারণ তাহা না করিলে কবিদ্বয়ের চরিত্র-চিত্রাঙ্কনের বিশেষত্ব ও তারতম্য বুঝিতে পারিবে না। অতঃপর আমরা পুনর্ব্বার সমালোচকের কার্য্য আরম্ভ করিব।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চরিত্রাঙ্কন প্রতিভা অপ্রাকৃত চিত্র।

(কবি দুই প্রকারের—সৃষ্টিকারী ও চিন্তাশীল। ইংরাজীতে রস্কিন এই দ্বিবিধ কবির নামকরণ করিয়াছেন Creative and Reflective. এই দুই শ্রেণীর কবি ভিন্ন তিনি অন্য কোন প্রকার কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মধ্যে সৃষ্টিকারী কবিগণের কার্য্য অপেক্ষাকৃত দুরূহ, কারণ তাঁহাদিগকে কল্পনার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করিলেই চলে না, যে চরিত্র সৃষ্টি করিবেন তাহার সহিত প্রচুর সহানুভূতির প্রয়োজন তাহা না হইলে চরিত্র-সৃষ্টি হয় না, চরিত্রের একটা আভাস দেওয়া হয় মাত্র। চরিত্র জানিবার জন্য তাহার সহিত নিজের মনকে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে।

To know a thing, what we can call knowing, a man must first love the thing, sympathise with it, that is, be intimately related to it.*)

(চরিত্রসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি উভয়ে অনেকটা উভয়ের অপেক্ষা রাখে। রসসৃষ্টি ব্যতিরেকে চরিত্র কখনও পুষ্ট হয় না, এবং চরিত্র-সংশ্লিষ্ট রস না হইলে তাহার গাঢ়তা হয় না। সেইজন্য রসাবতারণশক্তি কবির একটি প্রধান গুণ। আমাদের

* Carlyle—Hero as a poet.

অলঙ্কারশাস্ত্রে রস প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, কারণ কবি সৃষ্টিকারীই হৌন অথবা চিন্তাশীলই হৌন, মহাকাব্যই লিখুন, অথবা খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্যই লিখুন, যে পর্য্যন্ত তিনি রসাত্মক কথা লিখিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার লেখা কবিত্ব-সম্পর্কযুক্ত হইবে না।

রসের আশ্রয় মনুষ্যের চিত্তবৃত্তি, মনুষ্যের সুখদুঃখ, মনুষ্যের হৃদয়ান্তর্গত ভাব। যিনি এইগুলিকে পৃথক দৃষ্টির সাহায্যে দেখিয়া একটি সম্পূর্ণ মনুষ্যের চিত্র আঁকিতে পারেন, যিনি সহানুভূতি-বলে মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত ভাবটুকু আকর্ষণ করিয়া নিজের ক্ষমতায় তাহাকে লোকসমক্ষে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। যিনি তাহা না পারেন, তিনি কবিতা লিখিলেও কবি নহেন।

"To the poet as to every other we say "see". If you cannot do that it is of no use to keep stinging rhymes together, jingling sensibilities against each other and name yourself a poet."*

সুখ-দুঃখ ভাব প্রভৃতি লইয়াই মনুষ্য। মনুষ্য সমস্ত জগতেই প্রায় একরূপ, অন্ততঃ মনুষ্যের সুখ দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত জগতেই একই কারণে উদ্ভূত হয়, মানুষ যে সমাজে থাকে তাহার আচারপদ্ধতিতে, তাহার বাহ্য ব্যবহারের বিভিন্নতা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু মানুষ যে সমাজেই থাকুক তাহার

* Carlyle—Hero as a poet.

চিত্রবৃত্তিগুলির একই রকম; উন্নত সমাজেও মানুষ যাহাতে হাসে কাঁদে, অবনত সমাজেও মানুষ সেই সকল কারণেই হাসে কাঁদে, ইউরোপীয় জনগণ যাহাতে হাসে কাঁদে, বঙ্গের মানুষও সেই সকল কারণেই হাসে কাঁদে। যে সমাজভুক্তই হৌক একটি মানুষের যথাযথ চিত্র যদি কেহ আঁকিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি সকল সমাজের মানুষেরই ছবি দেখান। কবি নিজের সমাজ ছাড়িয়া অন্য সমাজ হইতে মানুষের ছবি আঁকিতে যান না। সেক্ষপীয়র ইটালীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার মানুষগুলাকেও ইংলণ্ডবাসীর চরিত্রযুক্ত করিয়াই আঁকিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজের সমাজের মানুষগুলিকে এত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত দেখিয়াছিলেন, তাহাদের চিত্তবৃত্তিগুলি এত সুন্দর এত সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল দেশের ও সকল সমাজের লোকের পক্ষেই সত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাঁহার ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিও মানুষের ছাচে ঢালা, তাঁহারা কবেকার লোক, কোনও ঐতিহাসিক ভ্রম হইতেছে কিনা, এ সকল কথা ভাবিবার তাঁহার অবসর ছিল না। Ruskin বলেন—

"If it be said that Shakespear wrote perfect historical plays on subjects belonging to the preceding centuries, I answer that they are perfect plays just because there is no care about centuries in them, but a life which all men recognize for the life of all time, and this is not because Shakespear sought to give universal truth,

but because painting honestly and completely from the men about him, he painted that human nature which is constant enough......... . ...And the work of these idealists is therefore always universal; not because it is not portrait, but because is complete portrait down to the heart which is the same in all ages; and the work of the mean idealists is not universal, not because it is portrait but because it is half portrait of the outside, the manners and the dress not of the heart Thus Finfort and Shakespear paint both of them, simply Venetian and English nature as they saw it in their time down to the root; and it does for all time"*

অতএব সৃষ্টিকারী কবিগণ আপন আপন সমাজের মধ্য হইতে মানুষ দেখিয়া তাহাদের চরিত্র চিত্রিত করেন, তাহাদের ভালমন্দ যাহা কিছু আছে, কল্পনার বলে সকলি তাঁহাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহারা কোনও আদর্শ গড়িবার ইচ্ছা করিয়া দোষ বাদ দিয়া গুণটুকু, অথবা গুণ বাদ দিয়া কেবল দোষটুকু দেখাইবার চেষ্টা করেন না। তাঁহারা একটি চরিত্রের সব দিক্ দেখাইতে চেষ্টা করেন। এই সম্পূর্ণ চিত্র প্রদানের ক্ষমতাই এই সকল কবির বিশেষত্ব।

এ বিশেষত্ব কল্পনা ভিন্ন আসে না। সকল বস্তুর অভ্যন্তর পর্য্যন্ত সমগ্র দর্শন কল্পনার কার্য্য। কেবল অনুভূতি দ্বারা

* Modern Painters. Vol. III.

এ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে, অনুভূতি (Fancy) বাহ্যমাত্র দেখে, কল্পনা ভিতরে প্রবেশ করে।] অনুভূতি অনেকটা প্রবৃত্তিময়ী, কল্পনা বা বুদ্ধিবৃত্তিশালিনী। অনুভূতি বল বা Fancy বল, ইহাদ্বরা উদ্ভাবন হয় না, কল্পনাই কেবল এই উদ্ভাবনীশক্তি প্রদান করিতে সক্ষম। অতএব কল্পনার কাছে ছোট বড় সবই সমান, সবই তাহার গ্রাহ্য ও ব্যবহার্য্য। আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণীবৃত্তি যাহা ফেলিয়া দিতে চায়, কল্পনাই তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। মহামতি রস্কিন বলিয়াছেন যে, আমাদের কল্পনা অশোভন উপচার সংগ্রহ করিয়া যে মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী-বৃত্তি সচরাচর যাহাকে Æsthetic faculty বলে এবং তিনি যাহাকে Theoratic faculty নাম দিয়াছেন, তাহার পদে পূজোপহার দিতে বাধ্য হয়। মানুষের দৈনিক কার্য্যকলাপ অনেক ক্ষুদ্রতার সমাবেশে গঠিত হয়, আমাদের সৌন্দর্য্যানুভব-শক্তি হয়তো সেই ছোট ছোট কার্য্যগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইবে, কিন্তু সেই ছোট ছোট কাজগুলির ভিতর হইতে মনুষ্যের চরিত্রের একটি অংশ হয়ত এমন অলক্ষ্যে বিকশিত হইতেছে যে, কল্পনা তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, সে সেই ছোট ছোট বিষয়গুলিকেও সাদরে গ্রহণ করিয়া বড় বিষয়ের সহিত মিশাইয়া স্বাভাবিক ভাবে এমন একটি চরিত্র গড়িয়া তোলে যে, সেই সম্পূর্ণ শিল্পের সৌন্দর্য্য আমাদের

সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিকেও বশীভূত করিয়া ফেলে। জগতে এমনি সুন্দর ও অসুন্দর বস্তু সর্ব্বদাই পাশাপাশি দেখা যায়, তাই কাল্পনিক কবি ইহার কিছুই বাদ দিতে পারেন না। এইজন্যই কালিদাস বা সেক্ষপীয়র ভালমন্দ কিছুই বাদ দেন না, মহাদেবের পার্শ্বে মদনকে চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হন না, কুশের পার্শ্বে অগ্নিবর্ণ বা ডেস্‌ডিমোনার পাশে ইয়ালোকে আঁকিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না।

এতদ্ভিন্ন কল্পনার আর একটি সহজ শক্তি আছে তাহা অসত্যকে সত্যবৎ প্রতিভাত করা। আমরা যাহা দেখিতে পাই না, কল্পনার বলে কবি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইতালীর কবি ডাণ্টে স্বীয় অদ্ভুত কল্পনার বলে স্বর্গপর্গেটরি ও নরক প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা স্বপ্নদৃষ্ট নহে, প্রত্যক্ষীকৃত। এই বর্ণনার মধ্যে কিছুই অস্পষ্ট নহে, কোনও কথা আভাসে বলা হয় নাই, কবি মানসনেত্রে যাহা স্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহাই দেখাইয়াছেন। যাঁহাদের কল্পনার শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প তাঁহারা এ সকল চিত্রে স্পষ্টতার পরিবর্ত্তে সাজানো অস্পষ্টতা আনিয়াছেন, মিল্টনের নরক-বর্ণনায় এইরূপ অস্পষ্টতা দোষ দেখা যায়। তাঁহার নরক অনেক পরিমাণে রহস্যময় (Mysterious)। সে কথা যাউক, এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, কবিগণ প্রায়ই অপ্রাকৃত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু এই অপ্রাকৃত চিত্রাঙ্কনবিষয়ে কবিগণের কল্পনা-শক্তির তারতম্য নিবন্ধন অনেক তারতম্য দেখা যায়।

একটা উদাহরণ দ্বারা এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। সেক্ষপায়র তাঁহার ম্যাকবেথ নামক নাটকে ম্যাক্‌বেথের সমক্ষে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, সে বর্ণনা এত ক্ষমতাশালী যে, আমরাও যেন ম্যাকবেথের সহিত সেই প্রেতাত্মাকে দেখিতে পাই ; এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, সেক্ষপায়র অপার্থিব হইলেও সেই প্রেতাত্মাকে দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন, ম্যাকবেথ যেমন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিল, সেক্ষপীয়রও তেমনি স্পষ্টরূপে তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এ একটা কৌশলমাত্র নহে, পূর্ব্বশ্রুত ভূতের গল্পের ছায়ামাত্র নহে, ইহা সত্য, সজীব প্রত্যক্ষীকৃত সত্য। সেক্ষপীয়রের শক্তিময়ী কল্পনা এই ঘটনা দেখিয়াছিল, দেখিয়া তবে তাহা বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু সেক্ষপীয়রের সমসাময়িক কবি মিড্‌লটন এইরূপ ক্ষেত্রে কি করিয়াছেন ? তিনিও প্রেতাত্মার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে যেন একটা আবছায়া মাত্র, তাহার অস্তিত্ব যেন অনুমান-সাপেক্ষ।

De Flores :—

Ha ! what art thou that takest
away the light
Betwixt that star and me ?
I dread thee not —
'Twas but a mist of conscience,
all's clear again
The Changeling.

Do Flores'ও ম্যাকবেথের মত হত্যাকারী, তাহার সমক্ষেও

হত ব্যক্তিরই প্রেতাত্মার আবির্ভাব কবি বর্ণনা করিয়াছেন, এবং খুব সম্ভব এই ঘটনা হইতেই সেক্ষপীয়র ম্যাকবেথের সমক্ষে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উভয় চিত্রে কি বিরাট ব্যবধান! কবি মিড্‌লটন Alonzoর প্রেতাত্মাকে আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তিনিই ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই তো ডি ফ্লোরিস দেখিবে কি? তাই সে সেই আবির্ভাবে বিচলিত না হইয়া Two but a mist of conscience বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল, কিন্তু ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, তাই সে আতঙ্কে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল—Thy bones are marrowless, the blood is cold প্রভৃতি বর্ণনা প্রত্যক্ষ না করিলে হয় না।

এইরূপ অপার্থিব বা অবাস্তবকে বাস্তবের মত দেখা ও দেখান কল্পনার একটি প্রধান কাজ। সকল মহাকবিই অপ্রাকৃতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহাই দেখান কি ইহার উদ্দেশ্য? (এ বিশ্বসংসারের প্রতি লক্ষ্য করিলে মানুষকে অভিশপ্ত দেবতা বলিয়াই কি মনে হয় না? নিজের কর্ম্মফলের হাত হইতে দেবতারও বুঝি নিস্তার নাই। মহামায়ার মায়া দেবতাও এড়াইতে পারেন না, তাই ভগবান বলিয়াছেন, "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।") আজকালকার পাঠক কথায় কথায় অভিশাপ দেখিয়া বড় ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু

এই অভিশাপ-ব্যাপারের ভিতর বিশ্বপরিচালিনী নীতির একটি সুন্দর নীতি প্রকাশিত হইতেছে। ভগবৎপদে সামান্য ত্রুটিও বিশ্বনিয়ন্তার কাছে মার্জ্জনীয় নহে, বিশেষতঃ যাঁহারা দেব-পদে উন্নীত হইয়াছে তাঁহাদের কাছে। আজ আমরা আমাদের দুর্দ্ধর্ষ ও দর্পিত জ্ঞানের প্রভাবে দেবতায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু পূর্ব্বে সকলে ঠাকুর দেবতা মানিতেন, অন্ততঃ আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয় মানিতেন, সে বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। আমরা দেবতা মানি না, কিন্তু মিণ্টনের আর্ক এঞ্জেলের বিবরণ পড়িয়া মুগ্ধ হইতে কোনও বাধা হয় না এবং ঈশ্বরাভিশপ্ত হইয়া আর্ক এঞ্জেল হইতে সয়তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গ হইতে নরকে নির্ব্বাসন-ব্যাপার বেশ সঙ্গত মনে করিয়া তদ্বিবরণ সম্বলিত কাব্যরস স্বচ্ছন্দে উপভোগ করিতে পারি। একটু ভাবিয়া দেখিলে এই অভিশাপ-ব্যাপার নিতান্ত হাস্যজনক নহে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। কিন্তু আমরা প্রথমেই একটা অন্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের মনটিকে এই ব্যাপারের বিপক্ষে দাঁড় করাইয়া তুলি; তখন আর অত ভাবিবে চিন্তিবে কে? নব্যসমালোচক লিখেন, "প্রাচীন কবিরা গণেশ-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা—উর্দ্ধপক্ষে বেশী দার্শনিক হইতে গেলে—পুরোণোক্ত সৃষ্টিরহস্য বর্ণনা করিতেন, ও নীলাম্বরের অহেতুক শাপে, ও ব্যাসকে জরতী বেশে অন্নপূর্ণার ছলনায়, দেবীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দেখাইয়া তখনকার পাঠককে রোমাঞ্চিত করিতেন। সে সকল বর্ণনায় নব্য পাঠকের মন ভক্তিরসার্দ্র

না হইয়া, এই কথায় কথায় অভিশাপ দেওয়া নিতান্ত অযোগ্য ও হাস্যরসোদ্রেককর খাম্‌খেয়ালি ব্যবহার মনে করিতেন।”

কথাটা কি সত্য? অন্যান্য বিষয়ে যে ভ্রম থাকে থাকুক, আমরা এখন এই নীলাম্বরের অভিশাপ-ব্যাপারটা একটু অভিনিবেশ সহকারে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমরা এখন অতিপ্রাকৃতের কথার আলোচনা কারতেছিলাম, অতএব এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এইস্থলে বলিয়া রাখিলে অশোভন হইবে না। নীলাম্বরের অভিশাপটা কি যথার্থই হাস্যরসোদ্রেককর? এই অভিশাপের ইতিহাসটা আমাদিগকে একবার স্মরণ করিতে হইতেছে। নীলাম্বর ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিবপূজার পুষ্পাহরণে আদিষ্ট হইয়া পুষ্প অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; ভগবতীর মায়ায় সে স্বর্গোদ্যানে পুষ্প না পাইয়া মর্ত্তে পুষ্পচয়নার্থ আসিয়াছে, সেখানে সে ধর্ম্মকেতু ব্যাধকে মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কহিতেছে—

'হৃদয়ে রহিল শাল, ব্যাধের জনম ভাল
কেনে হৈলাম ইন্দ্রের কোঙর॥
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে তৃষাকালে পাণি পিয়ে
যথাকালে করয়ে ভোজন,
পুর মথনের পূজা যাবত না করে রাজা
ততক্ষণ উদরদাহন॥

* * * *

সাজি দণ্ড হাথে করি প্রভাতে কাননে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার॥

চরণে কণ্টক ভুঁকে আঁচর শতেক বুকে
নিদারুণ দৈব আমার ।"

নীলাম্বর দেবতা হইয়াও ভগবতীর মায়া বুঝিতে পারিল না, সে সতৃষ্ণনয়নে স্বর্ণমৃগ দেখিতে লাগিল।

"অনিমিখ নয়নে দেখিল নীলাম্বর।
ফুল চিন্তা দূরে গেল ভাবেন কোঙর।"

পিতা কর্ত্তৃক ভগবৎসেবায় উপচার-সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়া নীলাম্বর একটা মায়ামৃগ দেখিয়া নিজ কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেলেন, এবং অপরের প্রতি ঈর্ষার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলেন। যেখানে অমৃতপানপুষ্ট হৃদয় নিত্যশান্তিময়, যেখানে ভগবৎ-চিন্তার বিরাম ও বাধা নাই, সেই অমৃতলোকনিবাসী হইয়া নীলাম্বর যে ক্ষুদ্রজনোচিত ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত শাস্তি কি নরলোকে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ নয়? তাই শিবরূপী ভগবান তাহাকে অভিশপ্ত করিলেন—

"মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর্ম্ম সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও তুমি ব্যাধ ॥"

ইহা কি পরমনীতিবেত্তার ন্যায়সঙ্গত বিচার নহে? আমি জিজ্ঞাসা করি যে, ইহা অপেক্ষা Satan (সয়তান) কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাকে স্বর্গচ্যুত হইয়া নরকে বাস করিতে হইল? Angelত্ব হারাইয়া সয়তান হইতে হইল। নিজের অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দেওয়া অর্থেই ভগবানের ন্যায়-বিচারে সন্দেহ, ইহা অপেক্ষা Adam and Eve (আদম ও হবা)

কি কিছু গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল যে, তাহাদের Paradise (স্বর্গীয় কানন) ত্যাগ করিয়া মর্ত্তে আসিয়া দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল? যিনি নীলাম্বরের অভিশাপকে অহেতুক, হাস্যজনক ও খামখেয়ালী ব্যবহারে পরিচায়ক বলিয়াছেন, তিনি কি এ সকল কথাগুলি একেবারে ভুলিয়াছিলেন? কিন্তু আদম ও হবাকে ভুলাইবার জন্য যেমন একজন সয়তান আবশ্যক হইয়াছিল, নীলাম্বরকে ভুলাইবার জন্য সে সয়তান আবশ্যক হয় নাই, তাহাকে ভুলাইয়াছিল ঈশ্বরেরই প্রকৃতি—ঈশ্বরের মায়াস্বরূপিনী মহামায়া। নির্ভীক ও সত্যতত্ত্বজ্ঞ সনাতন ধর্ম্মসকলেও সয়তানের অস্তিত্ব নাই, এবং এই নীলাম্বরের অভিসম্পাত-ব্যাপার দ্বারা জগতের একটি অত্যাবশ্যক ও অত্যুপকারী কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহা জগতে ঐশী শক্তির পূজা প্রচার। অভিশপ্ত নীলাম্বর অভিশপ্ত সয়তানের মত চিরদিন মন্দপ্রবৃত্তিময় হইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, অথবা আদমের অভিশাপের ন্যায়, তাহার অভিশাপ অনন্ত যন্ত্রণাময় হয় নাই। নীলাম্বরকে আদমের মত বলিতে হয় নাই—

All that I eat and drink or shall beget
Is propagated curse.

Did I request Thee maker from my clay
To mould me man? Did I solicit thee

From darkness to promote me, or here place
In this delicious garden. As my will
Concurred not to my being, it were but right.
And equal to reduce me to dust
Desirous to resign, and render back
All I received, unable to perform
Thy terms too hard by which I was to hold
The good I sought not. To the loss of that
Sufficient penalty, why hast thou added
The sense of endless woes ?

এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে আমরা কি বলিতে পারি যে, নীলাম্বরের অভিশাপ অহেতুক ও খামখেয়ালি ব্যাপার? কবি ভারতচন্দ্র কহিয়াছেন—

কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবন সার।
কর্ম্ম-হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥

এই দুইটি ছত্রে এই অভিশাপতত্ত্বের একটি সুন্দর সরল ব্যাখ্যা রহিয়াছে। স্বর্গে ও মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে, দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব পরস্পরার্থ ও ঘনিষ্ঠ কর্ম্ম সম্বন্ধে আবদ্ধ, এই তত্ত্ব এই অভিশাপ হইতে প্রকটিত হইতেছে। মুকুন্দরাম কবি, দার্শনিক নহেন; দার্শনিক যাহা তর্কযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন, কবি তাহাই সজীব চিত্রের দ্বারা দেখাইয়া দেন। মুকুন্দরামে দার্শনিক তত্ত্ব নাই, ইহাতে দুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ কোন কাব্যই কঠিন দার্শনিক তত্ত্বের সহযোগে উন্নতি-লাভ করিতে পারে না। দেবদেবীর বন্দনা করিয়া অথবা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন,

কাব্য আরম্ভ করিয়া তিনি আর কোথাও দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করেন নাই। কাব্য মধ্যে কূটতর্কের স্থান হয় না, ইহার পর তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা যুক্তিগ্রাহ্য নহে, হৃদয়-গ্রাহ্য। তিনি যাহা হৃদয়ের ভিতর অনুভব করিয়াছেন এবং ভক্তির চক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছেন। নীলাম্বরের অভিশাপ কাল্পনিক ব্যাপার বটে, কিন্তু মুকুন্দরাম তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়। ভক্ত কবি যাহা ভক্তি-তূলিকার সাহায্যে চিত্রিত করিয়াছেন, তখনকার ভক্ত ও বিশ্বাসবান্ লোকে তাহা হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত হইতেন; আমরা এখন বিশ্বাসহীন নির্জীব যন্ত্রবৎ পরিচালিত, আমরা তখনকার কবির বা তখনকার লোকের সরল বিশ্বাস বুঝিতে পারি না, তাহা কি কবির দোষ? আমাদের ভাল লাগে না বলিয়া তাহার একটা অন্যায় ও অযৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের অথবা একটা মনগড়া সাফাই দিবার কোনও হেতু নাই। আমাদের অনেক জিনিষই এখন ভাল লাগে না, এখন আমরা, যাহা সহজে বোঝা যায় না, তাহাকেই কবিত্বের চরম বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, বিদেশীভাবে যাহা সমাচ্ছন্ন তাহাকেই ভাল ভাবিতে শিখিয়াছি, তাই আমাদের আগেকার খাঁটি জিনিষ কিছুই ভাল লাগে না। তাই বলিয়া কাহারও নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া নিজের রুচির বিজয়-ঘোষণার প্রয়োজন দেখি না।

সে যাহা হোক্ আমরা অন্ততঃ এইটুকু লক্ষ্য করিতে পারি যে, মুকুন্দরাম যে অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার চক্ষে আবছায়ার মত দেখা দেয় নাই, তাহা বেশ স্পষ্টভাবে তাঁহার নয়নের কাছে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রকৃত মনুষ্যজীবনের সহিত অপ্রাকৃত ঘটনার অতি নিকট সম্পর্ক তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেন, সত্য হৌক বা মিথ্যা হৌক এই বিশ্বাস ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। তিনি যে অপ্রাকৃত ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা কাব্য লিখিবার খাতিরে নহে, তাই সেগুলি আজকালকার বিশ্বাসযোগ্য হৌক বা না হৌক, অন্ততঃ কষ্ট-কল্পিত নহে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তখনকার পাঠকও আমাদের ভিতর একটা বিরাট ব্যবধানের কল্পনা করিয়া আজকালকার সমালোচক নিজ উচ্চাসন হইতে তাহাদিগের প্রতি করুণ নেত্রপাত করিতে থাকুন, কিন্তু তখনকার পাঠকগণ যদি এই সকল চিত্রদর্শনে ধর্ম্মে মতিমান হইত ও ভক্তির দ্বারা হৃদয় স্নিগ্ধ করিতে পারিত তো তাহারা লাভবান্ বৈ ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। তাহারা কবির সহিত ঐশী-শক্তির প্রভাব অনুভব করিরা তৃপ্ত হইত। কবি মুকুন্দরাম হিন্দুকবি, হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসবান্, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রাণের সহিত, ভক্তির সহিত; ভক্তের পক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, কল্পনার সাহায্যে সজীব করিয়া তিনি সেই সকল চিত্র সত্য করিয়া তুলিয়াছেন। অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে আধুনিক কবিগণও

গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যে অতিপ্রাকৃত চিত্রে সত্যতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহা কেবল কবিত্বময় বলিয়া বিবেচিত হইয়া কবির কবিত্ব-প্রকাশের উপায় ব্যতিরিক্ত আর কিছু হয় নাই। মুকুন্দরামের কাছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনাযুক্ত সত্য ছিল, তাহা মাইকেল মধুসূদন-প্রমুখ আধুনিক কবিগণের কাছে Mythology না হয় সেটা "Grand mythology"ই হৌক। ভারতচন্দ্রের সময়ও তাহা গল্পে পরিণত হয় নাই, তাই তাঁহার মহাদেবের মূর্ত্তি অমন সুন্দর! ভারতচন্দ্রের কল্পনা সে সকল চিত্রকে তাঁহার চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত না করিলে তাহা কখনই অমন উজ্জ্বল হইত না। ভারতচন্দ্রের সময়ও লোকে বিশ্বাস হারায় নাই, তখনও লোকে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত, চরিত্রের বহু ক্ষতি সাধিত হইলেও তখনও লোকে ধর্ম্মের প্রতি অনাদর করিতে শিখে নাই; ভারতচন্দ্রেও যে অতিপ্রাকৃত আছে তাহা মুকুন্দরামের মত প্রাণস্পর্শী না হইলেও অনেকস্থলে স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তিনি অনুকরণ করিয়াছেন ও কৃত্রিমতা দুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। বলিয়াছি তো যে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। দুই একটি উদাহরণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ভগবতী মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালকেতুর ভবনে বিরাজমানা, ফুল্লরা অনেক বুঝাইয়াও তাঁহাকে সরাইতে পারিল না, তখন সে স্বামীর সন্ধানে গেল। পরে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল ও কালকেতুও তাঁহাকে

অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তো নড়িবেন না ; আজ কালকেতুর পরীক্ষার দিন। কালকেতু যখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ব্বাণে শর গ্রহণ করিল, এবং "ভানু সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর।" কিন্তু একি অপরূপ ঘটনা !

ছাড়িতে জুড়িতে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাথে শর রাহু যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
বল বুদ্ধি হত হৈল আখেটী নন্দন॥

একটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী চিত্র। এ অবস্থাটি কবির মৌলিক সৃষ্টি নহে তাহা আমরা জানি, ইহার মূল রঘুবংশ—

"বামেতরস্তস্য করঃ প্রহর্ত্তুঃ,
নখপ্রভা ভূষিত কঙ্কপত্রে।
সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব
চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।"

অবস্থা একরূপ হইলেও ভাবের পার্থক্যে চিত্রদ্বয়ে অনেক পার্থক্য আসিয়াছে ; বাহুস্তম্ভে দিলীপ রুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় "বিবৃদ্ধমন্যুঃ" বাহুস্তম্ভে কালকেতু পুলকে রোমাঞ্চিত। তাই বলিতেছিলাম যে, এ চিত্রদ্বয়ে পার্থক্য আছে, মুকুন্দরাম কালিদাসেরই মত কালকেতুর এই ভাববিহ্বল অবস্থা যেন চক্ষে দেখিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।

কালকেতুর যখন এইরূপ অবস্থা তখন দেবী কৃপা করিয়া তাহাকে আত্ম-পরিচয় দিলেন; কিন্তু কালকেতু তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে স্পষ্টই বলিল যে, শরস্তম্ভ ভেল্কী হইলেও হইতে পারে, সে বুঝিতে পারিল না যে, তাহার কোন গুণে দেবী তাহাকে এত করুণা করিবেন। তাই সে বলিল যে, আচ্ছা যদি মহিষমর্দ্দিনীরূপে তাহাকে দর্শন দেন তবে সে বিশ্বাস করিবে যে, তিনি যথার্থই ভগবতী বটেন। ভগবতী কালকেতুকে কৃপা করিয়া মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণ করিলেন, সে মূর্ত্তি কবি অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতু মায়ের সেই দানবদলনী মূর্ত্তির প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; দেবী তাহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন এবং তাহার প্রার্থনায় আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। তখন ব্যাধদম্পতী আনন্দে মাকে বরণ করিয়া লইল। আমরা দেখিতেছি যে, এই সকল অবস্থা, কবি গীতার অর্জ্জুন-কৃষ্ণ-সংবাদ হইতে লইয়াছেন, কিন্তু কালকেতুর অবস্থা এখানেও তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার তাহা ঈষৎ মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে। বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে মহাজ্ঞানী অর্জ্জুনও ভীত হইয়া বলিয়াছেন যে, সে মূর্ত্তি তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তিনি মূর্চ্ছিত হন নাই। অজ্ঞানী কালকেতুর পক্ষে তাহা স্বাভাবিক নহে, কবি মানসচক্ষে দেখিলেন যে, কালকেতু মায়ের বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চিত্রের জন্য মুকুন্দরাম ঋণী হইলেও তাঁহার কল্পনা এখানেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের চিত্রে বহুল পরিমাণে মুকুন্দরামের কাছে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এমন অবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু তিনি হরিহোড়ের অবস্থা মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার চিত্র দেখিয়া তাহার স্বাভাবিকতায় আমরা সন্দিহান হই। একটি যে অন্যের অনুকরণমাত্র তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। হরিহোড় অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইল কেন? মায়ের অমন কোমল, অমন আশাপ্রদ, অমন মনোহর মূর্ত্তি তো আর নাই, সে মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া হরিহোড় মূর্চ্ছিত হইল কেন? ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামে যে যে অবস্থা পাইয়াছিলেন তাহাই যথাদৃষ্ট তথালিখিত করিয়াছেন, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ।

রাজ-কবিগণের একটা দোষ যে, তাঁহারা যে রাজার সভায় বাস করেন তাঁহার স্তুতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। স্বয়ং সেক্ষপীয়র এই দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই। ভারতচন্দ্রে এই দোষ বিলক্ষণ লক্ষিত হইবে। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে যথেষ্ট ঋণী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের বলিতে হইতেছে যে, কবির মুখে ভাটের মত স্তুতি ভাল লাগে না। শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের স্তুতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারকে কাব্যের অন্যতম নায়করূপে কল্পিত করিয়াছেন এবং ইঁহার খাতিরে তাঁহাকে অনেক বাজে কথা লিখিতে হইয়াছে, ভবানন্দের প্রতি মায়ের কৃপা

কিছু ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মা তাহার খাতিরে দিল্লী সহরে ভূতের উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া বাদসাহকে বশ করিয়াছিলেন, এই খোসামুদি উপন্যাস শুনিলে স্তাবকের অতিপ্রশংসা-মূলক অলীক কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। এখানে যতগুলি অনৈসর্গিক ব্যাপার কথিত হইয়াছে সবগুলিই অপ্রাসঙ্গিক। ভারতচন্দ্রের রোগ, যাহা মুকুন্দরামে পাইয়াছেন তাহা কোন না কোনও আছিলায় নিজ কাব্যমধ্যে আনিতে হইবে, তা তাহা প্রাসঙ্গিকই হৌক বা অপ্রাসঙ্গিকই হৌক, সংলগ্নই হউক বা অসংলগ্নই হউক, সম্ভবই হউক বা অসম্ভবই হউক। কলিঙ্গভূপতি হিন্দু রাজা, তিনি যখন বুঝিলেন যে, একজন চণ্ডীভক্তকে তিনি অকারণ নির্য্যাতন করিয়াছেন, তখন তাঁহার চিত্তে চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদান স্বাভাবিক ও তাঁহার সেই স্বপ্নদর্শনও স্বাভাবিক এবং পরে কালকেতুকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করা বিচিত্র নহে। কিন্তু মুসলমান বাদসাহের জাগ্রত অবস্থায় ঐরূপ অনৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন। কিন্তু ভারতচন্দ্রকে তো ভবানন্দ মজুমদারকে বাড়াইতে হইবে এবং তাঁহার অন্নদামঙ্গল যে দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ-রচিত চণ্ডীকাব্য অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে, তাহা রাজসভায় তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে, অতএব অপ্রাসঙ্গিক হইলেও মায় "কমলে কামিনী" পর্য্যন্ত অন্নদামঙ্গলে "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া" বসিয়াছেন। এইস্থলে কতকগুলি অনৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে, সবগুলিই

কাব্যের খাতিরে, সহজ বা স্বাভাবিক ভাবে নহে। মেঘনাদ-বধে মায়াদেবীর কাছে গিয়া ইন্দ্রের দেবাস্ত্র-সংগ্রহের ন্যায় ইহা নিতান্তই নিষ্ফল ও নিরর্থক।

কিন্তু ভারতচন্দ্রে একটিও স্বাভাবিক অপ্রাকৃত চিত্র নাই সে কথা আমি বলিতেছি না। অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা এমনি একটি সরল চিত্র। ভারতচন্দ্র নিজের হাস্যময়ী কল্পনার বলেএই চিত্রটি বড় উপাদেয় ভাবে বড় রহস্যময় করিয়া আঁকিয়াছেন। ইহাতে সমালোচক-কল্পিত দেবীর "দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ"প্রকাশ হইতেছে কি না সে বিষয়ে আমাদিগের ভাবিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা যে স্বভাব-বর্ণোজ্জ্বল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং কবি যে এই দৃশ্যটি মনের চক্ষে বেশ দেখিতে পাইতেছিলেন ও মনে মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মুকুন্দরামেও চণ্ডীর জরতী-বেশ ধারণের বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা এত মনোজ্ঞ নহে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা আমাদের নয়নের সমক্ষে একটি জীর্ণবেশা শীর্ণদেহা শ্রবণবধিরা স্থবিরাকে যেন অবলীলাক্রমে জাগাইয়া তুলে; কবিকঙ্কণের বর্ণনায় তাহা হয় না। আর ইহাতেই মায়ের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপও দেখা যায়, তাহা, স্বীকার করিলেই বা ক্ষতি কি? মা আমার কত বেশে কত উপায়ে আমাদের সমক্ষে মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন, কত উপায়ে আমাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া! এ সংসারে কত শত লোক নিত্য মহামায়ার মায়ার ছলিত হইয়া

আত্মনিন্দায় দিন কাটায়, তাহা কি আমরা দেখিতে পাই না? যখন জ্ঞান হয় তখন বুঝিতে পারি—

"নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥"

জগতে সর্ব্বত্রই মহামায়ার ছলনা একথা বুঝিব না কেন? জগতের প্রধান কবিগণ কোনও না কোনও প্রকারে এই ছলনার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাকবি সেক্ষপীয়র ম্যাক্‌বেথ নাটকে ডাকিনী দ্বারা ম্যাকবেথকে ছলনা করাইয়াছেন, তাহা কি মহামায়ার ছলনার রূপান্তরমাত্র নহে? হিন্দু কবি মহামায়া ভিন্ন মনুষ্যের অদৃষ্টাধিষ্ঠাত্রী অন্য কোনও শক্তিকে জানিতেন না, চিনিতেন না, তাই এই ছলনা মহামায়ার; অন্য দেশের কবিগণকেও মনুষ্যের অদৃষ্টের উপর আধিপত্যময়ী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, এবং সমুন্নত প্রতিভাময় সকল কবিগণ তাহা স্বীকার করিতে ও দেখাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না বলিয়া যে, এই ছলনার অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। গ্রীকগণ তিনটি ভগিনীকে Destiny (অদৃষ্ট) রূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই আবার রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যাক্‌বেথে তিনি ডাকিনী ভগিনী হইয়াছে।

"And therefore no great realist in art has hesitated to admit the existence of what theologians name devine grace and of what theologians name Satanic temptations."

প্রভেদ এই যে হিন্দু সয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, ছলনার

জন্য মহামায়া ভিন্ন অন্য কেহ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহাই বিশ্বাস করিতেন। এক সময় এই তত্ত্ব বেকন প্রভৃতি মহাজ্ঞানীরাও বিশ্বাস করিতেন।

আমাদের কাছে যাহা ঠাকুরমার গল্প, হাসিবার বিষয় ও কবিকে উপহাস করিবার বিষয়, কবির কাছে তাহাই সত্য তাহাই সম্ভব।

"We slighter and smaller natures can deprive ourselves altogether of the sense for such phenomena ; we can elevate ourselves into a rare atmosphere of intellectuality and incredulity. The wider and richer nature of creative artists have received too large an inheritance from the race and have too fully absorbed all the influences of their environment for this to be possible in their case. While dein recollections and fore feelings haunt their blood they cannot enclose themselves in a little pinfold of demonstrable knowledge and call it the universe." *

অতএব অমরা এখন বলিতে পারি যে, নব্য সমালোচক যে কারণ দেখাইয়া মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ পরিহাস-শর বর্ষণ করিতেছেন, তাহা আদৌ সমীচীন নহে।

* Dowden—Shakesppear······His mind, and Art.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাকৃত চরিত্র।

এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয় মনুষ্য-চরিত্র কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমরা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার লইয়া এতখানি সময়ক্ষেপ করিলাম; তাহার কারণ এই যে, আমাদের কবিদ্বয় অনেক সময় এই ব্যাপারের সাহায্যে মনুষ্যচরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা আর একবার হরগৌরীর কথা পাড়িব। হরগৌরীর চিত্র অপ্রাকৃত চিত্র হইলেও কবিদ্বয় তাঁহাদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া অনেক ঘরের কথা প্রকাশ করিয়াছেন; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ চিত্রে কিন্তু প্রাকৃতের ও অপ্রাকৃতের এত মেশামিশি যে, ইহার ভিতর হইতে সাংসারিক চিত্রটি বাছিয়া লইতে হইবে। হরগৌরীর চিত্র দৈন্যের চিত্রে আরম্ভ। মুকুন্দরাম দৈন্যের চিত্র আঁকিতে সিদ্ধহস্ত, তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা যেন সজীব চিত্র একথা আমরা বলিয়াছি, তাঁহার নিজের দৈন্যাবস্থার স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্রও দীন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিও দৈন্যের চিত্র আঁকিয়াছেন। এই চিত্রে কতকগুলি বড় সত্য কথা আছে, কতকগুলি কথা এখন বাঙ্গালায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র গৌরীকে কোপনস্বভাবা করিয়া আঁকিয়াছেন; তিনি বেশ কলহ-পটু। কিন্তু এই কোন্দলের চিত্রটি স্বাভাবিক, আমাদিগকে

একবার হরপার্ব্বতীর দেবত্ব ভুলিয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে, তবেই এই চিত্রের যথার্থতা বুঝিতে পারিব। আমাদের ভাবিতে হইবে যে, একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহস্থ বয়োবৃদ্ধ, ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপজীবিকা অবলম্বনে অক্ষম বলিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা পরিবার পোষণ করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে একটি তরণী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার দুইটি পুত্র হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কয়েকটি পোষ্যবর্গও আছে। গৃহস্থ এককালে ভাল অবস্থায় ছিলেন, তাই ভিক্ষা করিতে তাঁহার ভাল লাগে না, লজ্জা বোধ হয়। একদিন গৃহস্থ ভিক্ষায় যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া স্ত্রীকে বলিতেছেন —

"সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘ ছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥
সর্ব্বদা কন্দল বাধে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়॥

কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবা করে তারা॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায়॥”

যাহারা দুঃখের সংসার কি তাহা জানেন তাঁহারা বুঝিবেন যে, এইকথাগুলি কত স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই কোন্দলের সূত্রপাতটি তত স্বাভাবিক নহে। মুকুন্দরামের চিত্র এ সম্বন্ধে অধিক স্বাভাবিক। যাহা হউক, এই কথাতেই কলহ আরম্ভ হইল, এবং হওয়া অস্বাভাবিক নহে। গৃহিনীটির মেজাজ সহজেই একটু কড়া, তাহার উপর দুঃখের সংসারে পড়িয়া, নিত্য জ্বালাতন হইয়া একটু বেশী মাত্রায় রুক্ষ হইয়াছে। গৃহিনীর উত্তর অথবা সপ্তমে চড়িয়া কন্দল, এ অবস্থায় পড়িলে স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটে।

“শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥

*　　　*　　　*　　　*

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পথের বল্মীক॥
সম্পদের নাহি সীমা বুড়াগরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দূকের কুঁজি॥

কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥

* * * *

গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥

* * * *

ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ুর উড়ায়॥
উপযুক্ত ছুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হৈল কড় সিদ্ধি বেঁটে বেঁটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আরতি কেবল আচাভুয়া॥

"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" বড় সমস্যা, বুড়াটির ঘরে আর বাক্যস্ফুর্ত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না, জবাব করিবেনই বা কি, কথাগুলো তো মিথ্যা নয়। কিন্তু সত্য কথাতেই আরও রাগ বাড়ে, ক্ষুধার জ্বালায় রাগের মাথায় বৃদ্ধ নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া ঘর ছাড়িয়া যাইতে কৃতসংকল্প।

"ঘর উজাড়িয়া যাব. ভিক্ষায় যা পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাস বাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয় ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।"

এই বলিয়া তিনি রাগ করিয়া যান; এ দিকে গৃহিণী পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সখী জয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে—

"কহে সখী জয়া শুন গো অভয়া
এ কি কর ঠাকুরালী।
ক্রোধে করি ভর যাবে বাপ ঘর
খেয়াতি হবে কাঙ্গালী॥
মিছে ক্রোধ করি আপনি পাসরি
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখ মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম
সংসার সাগর ভেলা॥
অন্নপূর্ণা হ'য়ে অন্ন দাও ক'রে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে পাছে॥
জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
তাহে দিবে সদা তাড়া।"

ভারতচন্দ্রের এই দৈন্যের চিত্র মনোরম হইলেও মুকুন্দ রামের দৈন্যের চিত্রের কাছে একটু খাটো। তাহার কারণ আমরা পূর্ব্বাভাসেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভারতচন্দ্রের স্ত্রী-পুরুষের কলহ-ব্যাপারটা অনেকটা সখের, কিন্তু মুকুন্দরামের চিত্রে এমন সৌখীনতার আভাস কোথাও নাই। জয়ার উপ-দেশ ফলে ভারতচন্দ্র যে ঘটনা ঘটিতে দেন নাই মুকুন্দরাম সরল রেখায় সেই চিত্রই আঁকিয়াছেন। মুকুন্দরামের চিত্রের সহিত বিদ্যাপতি-চিত্রিত শিব-পার্ব্বতীর চিত্রের অনেকটা সাম্য আছে।

ভারতচন্দ্র কহিয়াছেন—

"বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাসে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।"

মুকুন্দরামের মেনকা গৌরীকে ডাকিয়া বলিতেছেন—

"তোমা ঝি হইতে মোর মজিল গিরিয়াল
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল।
প্রভাতে খেজাড়ি মাঙ্গি কার্ত্তিক গণাই
চারি কড়ায় সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই।"

স্বামীর গর্ব্বে গরবিণী গৌরী মায়ের খোঁটা খাওয়া অপেক্ষা স্বামীকে লইয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃজ্ঞানে তখনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া নিজের ঘর বাঁধিলেন। সে ঘরে দারিদ্র্যের কলহ অবশ্যম্ভাবী, তাই কবিকঙ্কন সে চিত্র আঁকিয়াছেন; এ কলহে মর্ম্মান্তিকতা আছে, সৌখীনতার লেশমাত্র

নাই। যে দরিদ্র সে মনে করে যে, সংসার-খরচের জন্য সে যথেষ্ট দিতেছে, তবে সংসারে অভাব কেন? বুঝি অযথা ব্যয় হইতেছে। বৃদ্ধ শিব পূর্ব্ব দিন ভিক্ষা করিয়া অনেক আনিয়াছেন, তাই আজ গৃহিণীকে বলিলেন, "আজ আর বেরুনো হ'বে না, একটু বিশ্রাম করতে হবে, কাল যা এনেছি তাই বেশ করে রাঁধ বাড়, আরাম ক'রে খাওয়া যাক।" এই রাঁধিবার ফরমাসের ভিতর হইতে তখনকার গৃহস্থের (এখনকার গৃহস্থেরও নয় কি?) ভোজন-পারিপাট্যের একটা ছবি উঠিয়াছে। এ সময় যদি গৃহিণী বলেন যে, ঘরে তো কিছুই নাই—

"কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার সুধিলু
অবশেষে ছিল তাহা রন্ধন করিলু।
আছিল ভিক্ষায় কালি পালি দশ ধান
গণেশের মুষাতে তাহা কৈল জলপান।
আজিকার মত যদি বাঁধা দাও শূল
তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল।"

ইহাতে বুড়ার রাগ হইবারই কথা। দরিদ্রের ইহা স্বাভাবিক। নিজের নিঃস্বম্বলতার কথা তুলিয়া বুড়া গৃহিণীরই যত দোষ দেখিয়া রাগিয়া গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া গৌরীর অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার সেও বড় স্বাভাবিক—"করি আত্মঘাতী, বলেন পার্ব্বতী।"

"কি জানি তপের ফলে যে পয়্যাছি বর
পাটপড়সি নাহি আইসে দেখি দিগম্বর।
*　　　　*

ময়ূর মুষিকে হয় সদাই কন্দল
এই হেতু দুই ভাইয়ে দ্বন্দ্ব মোর কর্ম্মফল।
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি।

*　　　*　　　*

পায়ে ধরি উধার করি শুধতে কন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল।"

এই ধিক্কারবশে মুকুন্দরামের গৌরীও আবার পিত্রালয়ে যাইবার বাসনা প্রকাশ করায় পদ্মা তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া সময় ফিরাইবার কৌশল উপদেশ করিল, তাহার ফলে মর্ত্ত্যে মহামায়ার পূজার প্রকাশ।

ভারতচন্দ্রের গৌরীও রাগের মাথায় যাহাই বলুন তিনি মনে মনে বুড়া পতির প্রতি প্রেমময়ী ও সহজ বুদ্ধিমতী ছিলেন অতএব জয়ার উপদেশ তিনি গ্রাহ্য করিয়া বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন, এবং স্বামীকে ফিরাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি জগতের অন্ন হরণ করিয়া অন্নপূর্ণা হইয়া বসিলেন। ওদিকে শঙ্কর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া কোথাও অন্ন না পাইয়া শেষে লক্ষীর দ্বারে উপস্থিত। লক্ষ্মীর কাছে শিব অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন কিন্তু এমনি তাঁহার দুর্দ্দৈব যে, লক্ষ্মীর ঘরেও আজ অন্ন নাই। নিরাশায়, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় শিবের প্রাণ অস্থির হইল, তিনি নিজের অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"শুমস হইল গুঁড়',   না মিলিল খুদ কুড়া
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাভাতে যদ্যপি কয়   সাগর শুখায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হ'ল লক্ষ্মীছাড়া॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই   আর যাব কার ঠাঁই
ভুধনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বান্ধি চাই   তবু অন্ন নাহি পাই
কপালে দিলেক বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায়   হাভাতেরে নাহি খায়
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে   সেই না পোড়ায় বলে
না জানি মরি কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার   মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ।
যার নারী সুতাসুত   সদা অন্নকষ্টযুত
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥"

হায়! যাহারা এমনই কষ্টে পড়িয়াছে, তাহারাই বুঝিবে যে, এই কথাগুলি কত সত্য! মরণের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই যে সেই ব্যক্তির জীবন কাটে তাহা যেখানে দারিদ্র্যের চিত্র আছে, সেইখান হইতেই আমরা জানিতে পারি, সে চিত্র মুকুন্দরামই আঁকুন, বা ভারতচন্দ্রই আকুন, বা পিয়র লোটীই আঁকুন, অথবা ভিকটর হিউগোই আঁকুন। ভারতচন্দ্র দৈন্য কি তাহা জানিতেন এবং নিজেই বলিয়াছেন, "ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের

কন্দল।" দুঃখের বিষয়, ভারতচন্দ্র এমনই স্বাভাবিক চিত্র বড় বেশী আঁকেন নাই।

শঙ্করের দৈন্যের চিত্র এইখানেই শেষ হইয়াছে। লক্ষ্মীর পরামর্শে তিনি আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং অন্নপূর্ণা আনন্দে তাঁহাকে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দিয়া ভোজন করাইলেন, আমাদের ঘরে ঘরে এইরূপ অন্নপূর্ণা বিরাজিতা, অন্নপূর্ণারা অন্ন না দিলে আমরা খাইতে পাই না, খাইয়া সুখ হয় না। ইহার পর অনেকক্ষণ কবি প্রাকৃত ক্ষেত্র ছাড়িয়া অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, এবং তৎকালে সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইবার আমরা হরগৌরীর সুসম্পন্ন গার্হস্থ্যের অবস্থা দেখিতে পাইব।

হরগৌরীর এই অবস্থার চিত্রের সহিত আর একটি চরিত্র জড়িত আছে, তাহা ব্যাসের চরিত্র। ব্যাসের চরিত্র ভারতচন্দ্রের নূতন সৃষ্টি। কাশীখণ্ডে যে ব্যাসের চিত্র আছে তাহা হইতে কবি এই চিত্র পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইহাতে তিনি এমন রং ফলাইয়াছেন যে, ইহা নূতন সৃষ্টি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যাসের চরিত্র অনেকটা ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রের অনুরূপ, কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত ও ব্যাস দুইজন লোক। ব্যাসের চরিত্র কবির সৃষ্ট মনুষ্যের চিত্র। কেহ যেন মনে না করেন যে, মহাভারত-প্রণেতা বেদবিভাগকর্ত্তা, ব্রহ্মসূত্র-প্রণেতা মহাযোগী ব্যাসের সহিত 'অন্নদা মঙ্গলে'র ব্যাসের কোন সম্পর্ক আছে, এই চরিত্র-পাঠকালে আমাদিগকে সে ব্যাসকে মন হইতে

সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এ চরিত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইলেও ইহাতে কোনও আদর্শ জ্ঞানী পুরুষের চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই। তথাচ আমি মনে করি যে, এই ব্যাস-চরিত্রই ভারত-চন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-প্রতিভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতচন্দ্রের অপরাপর মনুষ্যচরিত্রগুলি প্রায়ই আংশিক চরিত্র প্রকাশ, এই ব্যাস-চরিত্রটাই সম্পূর্ণ একমাত্র বিচারোপযোগী চরিত্র, ব্যাসের চরিত্র মহৎ চরিত্র নহে, কিন্তু সত্য চরিত্র এরকম মানুষ আমরা জগতে প্রায়ই দেখিতে পাই। ব্যাস একজন সাম্প্র-দায়িক, অন্য সম্প্রদায়বিদ্বেষী, প্রথমে গোঁড়া বৈষ্ণব, শেষে কিছুই নয় অথবা শাক্ত, কি যা' হয় একটা কিছু। ব্যাস মহা-পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের বল আদৌ নাই, ধর্ম্মের মতে দৃঢ়তা নাই; কিন্তু অকারণ গোঁটুকু পূর্ণমাত্রায় আছে। ইহার উপর আত্মম্ভরিতা ও মদজনিত স্বার্থপরতা ও দ্বেষ তাঁহার চরিত্রে বিলক্ষণ বিদ্যমান।

ব্যাস চরিত্রের সঙ্গে হরগৌরীর চিত্র সুকৌশলে জড়িত। বৈষ্ণব ও শৈবের দ্বন্দ্ব উপলক্ষে কবি নিজের পরিহাস-রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য হাস্যরস-প্রধান কাব্য, ভারতচন্দ্র হাসির পক্ষপাতী। এই কাব্যে অন্য কোন রসের পরিপক্কতা লক্ষিত হইবে না। অনেকে ইহাকে আদিরস-প্রধান বলিয়া থাকেন, কিন্তু আদিরস ইহাতে একেবারে নাই, যাহা আছে তাহা এই রসের ভেঙ্গানি। করুণ রসের বা অন্য কোনও গাঢ়তর রসের অবতারণায় কবির কৃতিত্ব নাই, চেষ্টা

আছে, কিন্তু সাফল্য নাই। যে দৈন্যের চিত্র দেখাইয়াছি তাহাতে করুণরসের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু সে সকল করুণ রসের স্থায়িভাব নাই, ব্যভিচার ভাবের অস্তিত্ব কিছু আছে। ভারতচন্দ্র হাসিবার সুযোগ কখনও বাদ দেন নাই। সুখে দুঃখে সর্ব্বত্রই তাঁহার হাসির বিকাশ। তাঁহার হৃদয়ে এত হাস্যরাশি সঞ্চিত ছিল বলিয়াই তিনি রাজ্যচ্যুত, বিতাড়িত, লাঞ্ছিত হইয়াও চিরদিনের মত অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। তাই তাঁহার কাব্যে হাস্যরস কোথাও নিগূঢ়ভাবে, কোথাও স্পষ্টভাবে অহঃরহঃ প্রকাশিত হইয়াছে, দুঃখে দৈন্যে তাঁহার হাসির ফোয়ারা শুকায় নাই। 'অন্নদামঙ্গলে'র কাব্যাংশ হাস্যরসে আরম্ভ বলিলে, অন্যায় হয় না; প্রকৃতির রহস্যময়ী দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবে পুরুষরূপী মহাদেবের আত্মবিস্মৃতিতে এই হাস্যরস নিগূঢ়ভাবে বিরাজিত। তাহার পর দক্ষ যজ্ঞবিনাশকালে ভার্গবাদির দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি হাসিয়া লইয়াছেন। মহাদেব যেখানে নারদকে বলিতেছেন, 'বিলম্ব না কর আজি চল মোর বাপা', সেখানে আদর্শ চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দেশের একটা কু-প্রথার প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কবি মনে মনে হাসিয়া লইয়াছেন। তরল হাস্য, সরল হাস্য, করুণ হাস্য ও নষ্টামিপ্রিয় হাস্য সকলই ভারতচন্দ্রের কাব্যে অজস্র মিলিবে। ভারতচন্দ্র যেমন একদিকে 'জীবনতারা' ও 'কামিনী কুমার' প্রভৃতি রচয়িতৃগণের পূর্ব্বপুরুষ, তেমনি অন্যদিকে দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু-প্রমুখ হাস্যরসিক কবি-

গণেরও পূর্ব্বপুরুষ। আবার চিত্রাঙ্কনবিষয়ে মাইকেল প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী। ভারতচন্দ্র যে ভাল কথা বলিতে পারেন অনেকে সে কথা জানেন না, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব যে, এই ব্যাসের চিত্রাবলম্বনে তিনি যথার্থই অনেকে সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপদেশ।

"অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তবীর।"

হিন্দুর পক্ষে এমন অমূল্য উপদেশ আর নাই।

কবি যখন প্রথমে ব্যাসকে আমাদের সমক্ষে আনিলেন তখন ব্যাস একজন গোঁড়া বৈষ্ণব, তিনি পণ্ডিত, ধর্ম্মে বড় এবং জগতের হিতে রত; লোকে যাহাতে ধর্ম্মে মতিমান হয় সর্ব্বদা তাঁহার এই চেষ্টা—

"জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হয়ে ক'ন
ধর্ম্মে মতি হউক সবার॥
ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥

কিন্তু তাঁহার মৌলিক ভুল—তিনি অভিন্নকে ভিন্ন করিয়া দেখিতেন, তাই তাঁহার ধর্ম্ম ভিত্তিহীন। তিনি জানিতেন যে, "নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার", তথাপি তাঁহার গোঁড়ামি যায় নাই। এই গোড়ামিই জগতে অশেষ অনর্থের মূল। এই কারণেই জগতে ধর্ম্মের নামে কত জীবহত্যা হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্যাস ও ঋষিগণের কলহে কবি এই

সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাদের তর্কের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্বের অবতারণা আছে, এবং কবির দুরূহ সমস্যা সহজ কথায় বুঝাইয়া দিবার ক্ষমতা বেশ বিকশিত হইয়াছে।

"কি করিল ব্যাসদেব না পারি সহিতে।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়।
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়॥
তমগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥

এইরূপে দুই দল কলহ করিতে করিতে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও ব্যাস শিষ্যবর্গসহ মহানন্দে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কবি এইখানে কীর্ত্তনের একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন। কিন্তু ব্যাস হরিনাম করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; গোঁড়ার যাহা স্বাভাবিক দোষ তাহাই করিলেন শিবনিন্দা করিলেন। আমরা একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক পাদরীর কাছে মার্টিন লুথরকে সংস্কারক (Reformer) বলিয়াছিলাম তাহাতে তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "Oh you call him a reformer, he was a deformer" ব্যাসও তাহাই করিলেন। তাহার পর শিবের ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল বিষ্ণু আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাতে আর শিবে কোনও ভেদ নাই, ব্যাস যদি শিবের স্তব করেন তবেই তাঁহার নিস্তার। ব্যাস শিবের স্তুতি করিয়া হঠাৎ গোঁড়া শৈব হইয়া পড়িলেন। এইরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন আমরা অনেক দেখি-

য়াছি। এরূপ পরিবর্ত্তনে গোঁড়ামি ভয়ানক রকম বাড়ে। ব্যাস হরিনাম করাই ছাড়িয়া দিলেন, বৈষ্ণবের চিহ্ন একেবারে দূর করিয়া শৈব সাজিয়া বসিলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মনে ইহাতে হাস্যরসের সঞ্চার হইল, হইবারই কথা। তিনি হাসিয়া নন্দীকে কহিলেন—

"দেখ দেখ ওহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হৈল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল।
* * * *
মোর ভক্ত হ'য়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমি তো তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥"

অতএব ব্যাসকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাদেব কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা নিষেধ করিলেন। ব্যাস ভিক্ষা না পাইয়া ক্রোধে কাশীতে শাপ দিলেন এবং অন্নপাত্র ফেলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া চলিলেন; এমন সময় অন্নপূর্ণা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে অন্ন দিতে চলিলেন। কবি বলিয়াছেন, "শত্রু মিত্র এক ভাব অন্নদার কাছে।"

এতক্ষণে আমরা আবার হরগৌরীর সুখের দাম্পত্যচিত্র দেখিবার অবসর পাইলাম। অন্নদা সখী লইয়া চলিয়াছেন, পথে মহাদেব আসিয়া বলিলেন—

"কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ।"

৯

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা—চোখের অন্তরাল হইলেই জগৎ শূন্য বোধ হয়। গৃহিণী একে পাকা গৃহিণী, তায় সর্ব্বভূতে দয়াময়ী, তাহার উপর স্বামী সোহাগিনী, স্বামীর কীর্ত্তিতে কোনওরূপ পাপ স্পর্শ করে তাহা তাঁহার বাঞ্ছনীয় নহে। তাঁহার উত্তরটি বড় সরস—

"ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসে থাক॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতরার ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল॥

* * *

কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে।
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া॥
আমার দুর্ণাম হবে না দেখ ভাবিয়া॥"

বুড়াটির মহা বিপদ, গৃহিণী অন্ন দিতে চলিয়াছেন, তিনি অন্ন নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণীকে নিষেধ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই; ছলে নিষেধ করিতে গিয়া একটু মিঠেকড়া গোছের ভৎর্সনা শুনিতে হইল, অধর স্ফুরিত দেখিয়া—

সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান।

আর

"সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হেদে দেখ লো বিজয়া॥"

অন্নপূর্ণা সুন্দরী গৃহস্থবধূ সাজিয়া ব্যাসকে ঘরে আনিয়া চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা সশিষ্যে ভোজন করাইলেন, কিন্তু ব্যাসের সঙ্গে তর্ক করিতে গিয়া বুড়া গৃহস্থ বড় গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিলেন; বুড়া বয়সেই মতের মিল না হইলেই ক্রোধ হওয়া কত স্বাভাবিক তাহা সকলেই জানেন। রাগ করিয়া মহাদেব ব্যাসকে কাশী হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, অন্নপূর্ণার ভয়ে অধিক কিছু ক্ষতি করিলেন না। ব্যাস ভয়ে অন্নপূর্ণার শরণাপন্ন হইয়া, দুই দিন মণিকর্ণিকায় স্নানের আদেশ পাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহে ব্যাসের হৃদয় দ্রব হইল না, তিনি বিশেষ অপমানিত বোধ করিয়া, শিবের প্রতি মহা রুষ্ট হইলেন। চঞ্চলমতি ব্যাস একটা গোঁ ধরিয়া বসিলেন দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিবেন, শিবের সহিত টক্কর দিয়া জিতিবেন। বিষ্ণুকে ত্যাগ দিয়াছেন, এখন শিবকেও ত্যাগ দিয়া ব্রহ্মার শরণ লইবেন। প্রথমে গঙ্গাকে আনা চাই, গঙ্গার মহিমা যখন তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তখন গঙ্গা তাঁহার উপরোধ রাখিতে বাধ্য, তা সে উপরোধ ন্যায়ই হউক বা অন্যায়ই হউক অতএব ব্যাস গঙ্গাকে খুব স্তব করিলেন, খুব খোসামুদি করিলেন, কিন্তু গঙ্গা বলিলেন, তাও কি হয়।

'শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস ॥
কে তুমি কি কীর্ত্তি আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর ॥"

স্বার্থপর ব্যাস স্বার্থহানিতে চটিয়াই আকুল, গঙ্গাকে কুৎসিত গালাগালি দিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইলেন। গঙ্গার কাছেও যথেষ্ট তিরস্কার খাইলেন। গঙ্গার কাছে অকৃতকার্য্য হইয়া বিশ্বকর্ম্মার শরণাগত হইয়াও ব্যাস নিস্ফল হইলেন, তাঁহাকেও গালি দিতে ছাড়িলেন না। শেষ সম্বল ব্রহ্মা তিনিও সাফ জবাব দিয়া গেলেন; অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু ব্যাসের সে উপদেশে ফল হইল না, তাঁহাকে নিজের নাম বজায় রাখিতেই হইবে, ব্যাস-কাশী করিতেই হইবে। ব্যাসের চরিত্রে যদি নৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হইত ত তাঁহার এই গোঁ অনেক কাজ করিত—

"যে হউক সে হউক আরও করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥"

—অমূল্য প্রতিজ্ঞা যদি ভাল কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাসের প্রতিজ্ঞা অনেকটা সয়তানের প্রতিজ্ঞার মত ভগবিরুদ্ধে, ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত হইয়াছে। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যও অনেকটা সয়তানের মত নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখা। তাই এ প্রতিজ্ঞায় তাহার কোন ফল হইল না, এবং বিপরীত ফল ফলিল। তিনি এবার শম্ভু ছাড়িয়া শক্তির উপাসনায় মন দিলেন। তিনি বুঝিলেন না যে, যিনি সতীশিরোমণি তিনি পতির মান খর্ব্ব করিয়া তাঁহার মান রাখিলেন না। যাহা হউক তিনি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার যে মূলে ভুল

হইতেছে তাহা তিনি ভাবিয়াও দেখিলেন না। ওদিকে অন্নপূর্ণা স্বামী-পুত্রকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেছেন, এখন তাঁহাদের অবস্থা বড় সচ্ছল, পতিপুত্র যত খান, অন্নপূর্ণা তত দেন, কেহই খাইয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না, এই আনন্দময় কৌতুকের সময় ব্যাসের ডাকাডাকি তাঁহার কানে পঁহুছিল তিনি হঠাৎ অন্যমনা হইলেন—

"কপালের টাক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে
উছুট লাগিয়া পা টলে।"

তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এদিকে মহাদেব তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া একটু রহস্য করিয়া কহিলেন—

"মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই জানি নাই তোমা বই
এক মুঠা অন্ন মেনে দিও॥"

তিনি গৌরীর কাছে যে উত্তর পাইলেন তাহা সতীরই উপযুক্ত—

"এত বড় তার সাধ তোমা সনে করি বাদ
করিবেক ব্যাস-বারাণসী॥"

ইহার পর তিনি জরতী বেশে ব্যাসকে ছলনা করিতে চলিলেন, এবং ব্যাসের সমক্ষে মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সকল প্রযত্ন বিফল করিয়া আসিলেন। যখন ব্যাসের জ্ঞানোদয় হইল তখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মূলে ভুল হইয়াছে, তিনি ভ্রান্তিবশতঃ সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিয়াছেন।

যখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল তখন অন্নপূর্ণা তাঁহাকে অমূল্য উপদেশ দিয়া প্রকৃতিস্থ করিলেন—

"ইতঃপর ভেদদ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে বিফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্তবীর॥"

এই জরতীবেশে ছলনার চিত্রটি এত স্বাভাবিক ও এত হাস্যরসোজ্জ্বল যে ইচ্ছা হয় একটির সমস্ত তুলিয়া দেখাই। যাঁহারা একটু পূর্ব্বসংস্কারশূন্য মানস লইয়া একটু বুঝিবার ইচ্ছা লইয়া, এই চিত্র পাঠ করিবেন তাঁহারাই ইহার যথার্থ রস উপভোগ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। ব্যাস-চরিত্রের ইহাই যে অবশ্যম্ভাবিনী পরিণতি তাহা কোনও সদ্বিবেচকের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। কাব্যে হরগৌরীর চিত্রের কবি এইখানে অবসান করিয়াছেন; বলা বহুল্য, এই চরিত্রত্রয়ের কবি অনেক সাংসারিক জ্ঞান এমন সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কবির এক একটি কথা চিরস্মরণীয় প্রবাদে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য-চরিত্র বিদ্যাসুন্দরে।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরামের মধ্যে মনুষ্যচরিত্র-চিত্রণবিষয়ে প্রভেদ এই যে, ভারতচন্দ্র মনুষ্য-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে দেখাইবার বিশেষ কোনও প্রয়াস করেন নাই, মুকুন্দরাম যে মনুষ্য-চরিত্র-গুলি আঁকিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ। কিন্তু ভারতচন্দ্রও সংক্ষেপে অনেক সাংসারিক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়াছি। আমরা হরিহোড়ের উপাখ্যান হইতে এইরূপ সংসারিক জ্ঞানের কিছু পরিচয় লইব। সংসার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সেক্ষপীয়র কালিদাসের যেমন "Aphorism" (সূত্র) আছে, তাহা কতকগুলি উঠাইয়া দিতেছি, এগুলি বাঙ্গালায় এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। যথা—

"গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে।"

যথার্থই সংসারের স্থিতি গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমস্ত দুর্ঘটনা সুগৃহিণীত্বের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, অন্নপূর্ণার কৃপা বিনা কেহ অন্ন পায় না, যে গৃহিণী ভক্তিভরে সেই বিশ্বশক্তির পূজা না করে সে সত্যই গৃহিণীপণা জানে না। অন্নদার কৃপা হইলে "মাটিমুঠা ধর যদি সোনামুঠা হবে।")

"সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না র'ন সেখানে" ॥

ইহাও একটা অমূল্য উক্তি।

এইরূপ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় ভারতচন্দ্রে আমরা সর্ব্বত্রই পাইয়া থাকি। বিদ্যাসুন্দর কাব্যেও এই সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় যথেষ্ট মিলিবে। সেখানেও এক একটা এমন কথা আছে যাহা আজকাল সকলের মুখে প্রবাদের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছে।

"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ॥"

*　　*　　*

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।"

*　　*　　*

"মূঢ় নয় যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা।"

*　　*　　*

"যার কর্ম্ম তারে সাজে,
অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

*　　*　　*

"ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কে বর্ত্তমানে মরে।"

*　　*　　*

"লোকে বলে পাপ কাজ ক'দিন লুকায়।"

"লোভের নিকটে ফাঁদ যদি পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
দেব উপদেব পড়ে তন্ত্র মন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্মদেহ ফাঁদে পড়ি কাঁদে॥"

*　　　　*　　　　*

"ইথে মৃত্যু বরঞ্চ বিষয় জ্ঞানা চাই।
বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়া কাপুরুষতাই॥"

*　　　　*　　　　*

"কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যাউক জানা॥"

*　　　　*　　　　*

"নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥"

এমনি ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যান্য অংশেও বহুল সাংসারিক তথ্যের সমাবেশ আছে। এই সাংসারিক জ্ঞানের অস্তিত্ব-বশতঃ তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলি নিতান্ত অলীকত্ব-রাগরঞ্জিত হয় না। ভারতচন্দ্রের চরিত্রে তৎকালীন লোকের প্রতিমূর্ত্তি সহজেই দেখা যায়। ভবানন্দ মজুমদারের চরিত্রটী লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই চরিত্রে ভারতচন্দ্র সে সময়কার বাঙ্গালী সমৃদ্ধ গৃহস্থের একটা নিখুঁত ছবি তুলিয়াছেন। ভবানন্দের চরিত্রে যে বিষম দুরপনেয় কলঙ্ক ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে, কবি লুকাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা ঢাকা পড়ে নাই সত্য

কিন্তু সে দোষ স্খালনের প্রয়াস করিয়াছেন বলিয়া ভারতচন্দ্রকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইবে না, কারণ তিনি যে রাজার আশ্রয়ে শান্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ভবানন্দ সেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ, ও সেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, অতএব ভারতচন্দ্রের পক্ষে তাঁহার নিন্দা করা অসম্ভব। ভবানন্দের চরিত্রে ভারতচন্দ্র একটু উচ্চতা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভবানন্দ দেশের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের ভাল করিয়াছিল, কবি সে কথা লুকাইয়া তাহাকে একজন ভক্তবীর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং তাঁহার খাতিরে অনেক অদ্ভূত কথার অবতারণা করিয়াছেন। সত্য হউক বা না হউক, এই উপলক্ষে কিন্তু ভারতচন্দ্র নিজের কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হইয়াছেন তাহা অমরা আমাদিগের তৃতীয় প্রবন্ধে বলিয়াছি। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতি সিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্‌॥"

পণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র বোধ হয় এই শ্লোক দেখিয়া তাঁহার ভবানন্দ-চরিত্র গড়িয়াছিলেন, তাহার উপর কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন্ত চরিত্র হইতেও কতক উপকরণ যে সংগ্রহ না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সে যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র দুই একটি ভাল কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন ও বলিয়াছেন।

"অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুর মাথে॥"

ভারতচন্দ্রের চরিত্রগুলি প্রায় আভাসেই চিত্রিত হয়, কিন্তু এই ভবানন্দের চরিত্র বিষয়ে সে নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ; ভবানন্দের চরিত্র কবি একটু বিস্তৃতভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। ভবানন্দের চরিত্রে কবি শুধু জ্ঞান, সৎসাহস ও ভক্তিরই সমাবেশ করেন নাই, রসিকতারও আরোপ করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতা তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। ভবানন্দের চরিত্রেও সেই সরস রসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দর কাব্য কোনও গভীর উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস ; কিন্তু ইহাও সত্য যে, কবি এই কাব্যে হাস্যরসের অবতারণার অনেক সুবিধা পাইয়াছেন,ও সে বিষয়ে একটু কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন। ফলতঃ ইহা বেশ অনুভব করা যায়, কবি সে সময়কার সকলকারই উপর বেশ হাসিয়া হাসিয়া কশাঘাতকরিয়াছেন। সে কশাঘাতের হস্ত হইতে রাজা-রাণী, ছোট বড় মায় কবি নিজেও বোধ হয় বাদ পড়েন নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে কবি নিজে আদিরস-সংক্রান্ত কাব্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে,এ কাব্য আদিরসের বিন্দুমাত্রও নাই, ইহাতে হাস্যরস ভিন্ন অন্য কোনও রসই নাই, আছে কেবল উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরতা। ইন্দ্রিয়পরতার অসংযত ইন্দ্রিয়-বিকৃতিতে রস পাওয়া যায় না, ইহাতে কেবল

মনে ঘৃণার ভাব উপস্থিত হয়। হইতে পারে যে, সে সময়কার লোকে এইরূপ কুৎসিত আমোদ ভালবাসিত, তাই কবি বিদ্যা-সুন্দরের সৃষ্টি করিয়াও নিন্দার্হ নহেন।) আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যদি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরেই অশ্লীলভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে তত নিন্দা করিতাম না, কিন্তু তিনি কেন যে সবিশেষ নিন্দার যোগ্য তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(যদি একটা সম্পূর্ণ চরিত্র চিত্রিত করিবার জন্য কোথাও অশ্লীলতার অবতারণা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে অশ্লীলতা ততটা দোষের নহে, এমন অশ্লীলতা সেক্ষপীয়রে আছে, কালিদাসের আছে, মুকুন্দরামেও আছে। যথার্থতঃ তাহা হয় ত স্বাভাবিক উচ্ছাস—মনুষ্যের চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী অভি-ব্যক্তি, সেস্থলে তাহাকে অশ্লীল বলিয়া বাদ দিলে হয় ত সেই চরিত্রের অঙ্গহানি করা হয়, তাই তাহা অশ্লীল হইলেও ততটা দোষের হয় না। (ভারতচন্দ্রের বসুন্ধর-চরিত্র অসংযত চরিত্র, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক যে, তাহাকে আমরা অশ্লীল বলি না; যৌবনমদমত্ত যুবক-যুবতীর পক্ষে বসুন্ধর-বসুন্ধরার মত ব্যবহার স্বাভাবিক। সেইরূপ তাঁহার নল-কুবেরের চরিত্রও স্বাভাবিক—এত স্বাভাবিক যে তাহা যেন আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষীকৃত। মানুষের অন্ততঃ অধিকাংশ মনুষ্যের এমনই সময় এমনি মনের ভাব আসে—

"এমন শুনিয়া হাসিয়া ঢুলিয়া
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।

মাথা হেলাইয়া অঙ্গ দোলাইয়া
জড়িত যুক্ত বদনে ॥
অতি মত্ত মদে না গণে আপদে
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥
এ সুখ যামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক ॥

তাই এই নলকুবেরের চরিত্রকে কেহ অশ্লীল বলেন নাই—বস্তুতঃ ইহা অশ্লীল নহে। নলকুবের এখনকার বাবুদের পূর্ব্বপুরুষ, বাবুদের কাছে ধর্ম্মের কথা পাড়িলে তাহারই মত উত্তর পাওয়া যায়। অনেকের মুখে পিতৃধনগর্ব্বিত 'রমানাথের ষাঁড়ে'র বিবরণ শুনা গিয়াছে, সেই বিবরণ শুনিলে আমাদের মনে নলকুবেরের কথা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে।

✓ কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নায়ক ও নায়িকা অন্য ধাঁজের। কবি এই দুইটী চরিত্রে মানুষের একটা অতি কদর্য্য বৃত্তিকে এতটা প্রশ্রয় দিয়াছেন যে, ইহাতে রস একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের জাগরণে নিদ্রায়, শয়নে স্বপনে, নিকৃষ্ট দৈহিক আলিঙ্গন ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তা নাই, এই দৈহিক মিলন কেবল চপলতাময়, প্রেমের সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। সমগ্র কাব্যখানি কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়লোলুপতার বিকৃত নিদর্শন মাত্র।

কবির সুন্দর একটা পশুরও অধম—ইন্দ্রিয়মদে একেবারে জ্ঞানহীন। কবির নায়িকারও প্রায় তদবস্থা, কুৎসিৎ ইন্দ্রিয়-তাড়নে তাহারা উভয়েই হিতাহিত-বিচারশূন্য, অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল বাসনাময়। শুধু চরিত্র সম্পূর্ণ করিবার অনুরোধে কবি এই ইন্দ্রিয়পরতার চিত্র আঁকেন নাই, ইন্দ্রিয়পরতাই তাঁহার প্রধান উপকরণ, তাই বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীল—একটীও কুৎসিৎ বা অশ্রাব্য শব্দ না থাকিলেও ইহা অশ্লীল। হইতে পারে ইহা তাঁহার সময়ের দোষ; কতক পরিমাণে যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই. এমনও হওয়া সম্ভব যে, বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রের জীবন্ত উপকরণ কবি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল নহে তাহা বলিবার উপায় নাই।

মুকুন্দরামেও দৈহিক মিলনের চিত্র আছে, কিন্তু তাহা যে বিদ্যাসুন্দরের দৈহিক মিলনের চিত্রের সমজাতীয় নহে, ইহা বুঝাইবার আবশ্যকতা করে না। ধনপতির খুল্লনা-সম্ভোগ যেখানে যে ভাবে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ভারতবর্ষীয় কবিরা স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্ভোগ বর্ণনা করা কখনই একান্ত বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করিতেন না; তাই মুকুন্দ-রাম তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বেশ বুঝিতে পারি যে, মুকুন্দরাম এই ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করেন নাই, এবং তাহাকে অনেক পরিমাণে প্রেম সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার লেখনী এ বর্ণনার কালেও অসংযত হয় নাই, এবং

কবির চিত্ত তৎসৃষ্ট চরিত্রের সম্পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া এই বৃত্তিকে প্রশ্রয় দান করে নাই।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের প্রধান দোষ স্ত্রী-চরিত্রের দুর্গতি করা। এ কাব্যে এমন একটাও স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কিত হয় নাই যাহা জঘন্য নহে। এ কাব্যের স্ত্রীলোকমাত্রেই যেন দুস্প্রবৃত্তিময়ী ইন্দ্রিয়-চপলা। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রী চরিত্রের কতক অবনতি হইলেও ভারতচন্দ্রের সময়েও বাঙ্গালী ললনা বিদ্যা-সুন্দরের নাগরিকাগণের মত চরিত্রহীনা হইয়া পড়েন নাই, তাহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের অন্যান্য কাব্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে সুন্দর পুরুষ দেখিলেই কুলস্ত্রীরা লোলুপদৃষ্টিতে তাহার পানে চায়, একথা সত্য নহে, তাই এইভাবে স্ত্রী-চরিত্রের অবনতি সাধনে কাব্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। সত্য বটে, এখানেও ভারতচন্দ্র বিষয় অন্য কবির কাছে পাইয়াছিলেন, এবং তাহাই মাজিয়া ঘষিয়া তাঁহার নিজস্ব যে ছন্দোভঙ্গী তাহাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিন্দার্হ; কারণ কবির কার্য্য নির্ব্বাচন; পরের কাছ হইতে যাহা পাইলাম, সবই যে লইতে হইবে এমন কোনও লেখাপড়া নাই, অতএব ভারতচন্দ্র রাম-প্রসাদের এই কুৎসিৎ অংশটুকু বাদ দিতে পারিতেন। তাহা যখন তিনি করেন নাই, তখন নিরপেক্ষ সমালোচকের কাছে তাঁহাকে অপদস্থ হইতেই হইবে। রাজারাজড়ার মেয়ে বিদ্যার পক্ষে যে কামোন্মত্ততা, অধৈর্য্য ও লজ্জাহীনতা শোভা পায়, নষ্ট চরিত্রা হীরার পক্ষে যে বেহায়াপণা সঙ্গত, কুলকামিনীগণের

পক্ষে তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। যে কবি সেই চিত্র দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যত মিষ্ট কথার সাহায্যেই তাহা প্রকাশ করুন, মিথ্যা কথা লেখার অপরাধে তিনি দোষী এবং তাঁহার কাব্য শুধু এই কারণেই অশ্লীল। ইহাতে যে কেবল সময়েরই দোষ দেখা যায় তাহা নহে; কবির রুচি ও শিক্ষারও দোষ লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যে বিকৃত রুচিবশতঃ ভারতচন্দ্র মহাদেবের চরিত্র ভ্রষ্ট করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই বিকৃত রুচিবশতই তিনি কুলকামিনীগণের চরিত্রও বিকৃত করিয়া জনসমাজে স্ত্রীজাতির মানহানি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা সুন্দর, তাহাকে সুন্দর বলিলে কোনও ক্ষতি নাই, যাহার নয়ন আছে সে সৌন্দর্য্য দেখিবে ও তাহার প্রশংসা করিবে। কালিদাস হিমালয়পুরীর কুলললনাগণের মুখে মহাদেবের রূপের অবাধ প্রশংসা করাইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া মহাদেবকে দেখিয়া তাহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছিল একথা বলেন নাই, তিনি বলান নাই।

"হলদি জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।"

সমগ্র বিদ্যাসুন্দরেই যেন স্ত্রীচরিত্রগুলি দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। কুলকামিনীরা ত সুন্দরকে দেখিয়া পাগল। বিদ্যার সখীগুলা নিতান্ত স্বার্থপর, তাহারা প্রিয়ম্বদা বা অনসূয়া অথবা বৈষ্ণব কবির সখীর মত সখী নহে। বিদ্যার যাহাই হউক তাহারা নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই ব্যস্ত। বিদ্যা নিজে বেহদ্দ

বেহায়া, মার সঙ্গে তাহার কথাবার্ত্তা যেন নাক্কারজনক, শুধু তাহাই নহে, সে এত কাম-বশীভূতা ও অসংযতচরিত্রা যে, হীরার মত স্ত্রীলোকের কাছেও তাহাকে উপদেশ পাইতে হয়। বিদ্যার মা যিনি রাজরাণী—তাঁহার কথাবার্ত্তা পাড়ার সর্ব্ব-প্রধান কুঁদুলীর মত, একেবারে বিবেচনাশূন্য ও গাম্ভীর্য্যহীন। বিদ্যার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তাও যেন ছোটলোকের মেয়ের মত, রাজার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও তেমনি জঘন্য। হীরামালিনী তো নামজাদা বঙ্গে মুসলমান প্রভাবে সমানীতা (সবে আমদানী) কুৎসিৎ-ব্যবসায়শালিনী স্ত্রীলোক। তাহার মত যে "কড়িতে সবই মিলে।" এমন স্ত্রীলোক স্বার্থপর ও নীচচেতা ত হইবেই। কিন্তু এই জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের ব্যবসায়ে খাতিরেই অনেক সাবধানে কাজ করিতে হয়, তাই মালিনী সমস্ত কাব্যের স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে একটু বুদ্ধিমতী। হীরার সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, সেও বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত মিলনের পক্ষপাতী ছিল না। অপরাপর স্ত্রীগণের চরিত্র "নারীগণের পতিনিন্দায়" প্রকাশ। স্ত্রীচরিত্রের প্রতি ভারতচন্দ্রের কোনও আস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরে যেন তিনি কোমর বাঁধিয়া স্ত্রীচরিত্রের অপমান করিতে বসিয়াছিলেন। ইহা কি কেবলই সময়ের দোষ? আমাদের পিতামহীরা কি যথার্থই এমনি চরিত্রহীনা ছিলেন? তাহা যদি না হয় তাহা হইলে আমি শতবার বলিব যে, বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীল, অতিশয় অশ্লীল।)

পুরুষ চরিত্রগুলিও স্ত্রীচরিত্রের অনুরূপ। তাহাদের ঘটে যে বিন্দুবিসর্গ বুদ্ধি আছে বলিয়া বোধ হয় না। নম্বর এক বেকুব—সুন্দর, সে দৈবানুগৃহীত, পণ্ডিত ও সুপুরুষ, যাহাকে আনাইবার জন্য বীরসিংহ লোক পাঠাইয়াছিল, তাহার চুরি করিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যা লাভ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? যাহা সোজা পথ হইতে তাহারই জন্য বাঁকা পথ ধরিরা কোটাল-লের কাছে লাঞ্ছনা ভোগ করিবার কি প্রয়োজন ছিল। শুধু বেকুব নয়, পশু অপেক্ষাও বেশী কামপরতন্ত্র; তাহার উপর বেহায়ার হদ্দ। কালিকার সম্বন্ধে যখন এমন মত তখনকার লোকের মনে আসিয়াছিল, তখন যে তাহার কিছুদিন পরে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব সহজ ও স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

দ্বিতীয় মূর্খ—দেশের রাজা, বীরসিংহ। বংশের কলঙ্ক লোকে প্রাণপণে ঢাকিতে চেষ্টা করে, এই মূর্খ তাহাই সহরময় ঢাক বাজাইয়া রাষ্ট্র করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং অচিরে ও অনায়াসে তাহা করিল। মূর্খত্বের ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমান আর কি পাওয়া যাইবে? যেমন রাজা তার উপযুক্ত কোটাল ধুমকেতু। অত্যাচারে সে বিশেষ মজবুত আজকাল-কার পুলিস কর্ম্মচারীদিগের মতই মজবুত। ভাগ্যে তাহার একটা বুদ্ধিমান ভাই ছিল তাই সে এ যাত্রা উদ্ধার পাইল। তারপর একশত জন মিলিয়া একজনকে ধরিয়া লম্ফঝম্ফই বা কত! মূর্খ রাজার মুর্খ অনুচরেরা রাজকন্যার কলঙ্ককাহিনী

ঘোষণা করিবার জন্য জগঝম্প বাজাইয়া বৰ্দ্ধমান সহর তোলপাড় করিয়া দিল।

তারপর মূর্খ রাজা আর কতকগুলি মূর্খ লইয়া প্রকাশ্য সভায় কন্যার কলঙ্ক-প্রচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শুধু তাহাই নহে, শত শত পারিসদ-বেষ্টিত হইয়া বেহদ্দ বওয়াটে সুন্দরের মুখে আপনার কন্যার রূপের উপর টীকা-টীপ্পনি এবং তাহার কামকলার বিজয়গাথা শুনিতে লাগিলেন। এ সকল মূর্খ যে ক্ষুদ্র শুকপক্ষীরও নিন্দার যোগ্য ও তাহার কাছেও উপদেশপ্রাপ্তির যোগ্য, তাহা কে অস্বীকার করিবেন। ভারতচন্দ্র এইখানে যদি রামপ্রসাদের অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভাষায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মত সুন্দর নহে বটে, ভাবে অনেক ভাল, অশ্লীল যথেষ্ট হইলেও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর চরিত্র সৃষ্টি-বিষয়ে ভারতচন্দ্র-রচিত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর শুধু মাধুর্য্যগুণে রামপ্রসাদের কাব্যকে কাণা করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, রামপ্রসাদের চরিত্র-গুলি প্রাণহীন নহে, এমন কি তাঁহার হীরা মালিনীও হৃদয়হীনা নহে। রামপ্রসাদের কাব্যে কৌশলও যথেষ্ট আছে, কোটাল কর্ত্তৃক চোর-ধরা ব্যাপার তাঁহার কাব্যে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক ও কৌতূহলোদ্দীপক। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এক ছন্দ ভিন্ন সবই যেন সৃষ্টিছাড়া ও বেয়াড়া। তাই আমি বলিয়াছি যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যসমষ্টি হইতে বিদ্যাসুন্দর তুলিয়া

দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি তো নাই-ই, বরং তাহাতে ভারতচন্দ্রের গৌরবই বৃদ্ধি পায়।)

মনুষ্যের দৈহিক বৃত্তি লইয়া সে কাব্য নাড়াচাড়া করে, যাহাতে মনুষ্যের হৃদয়ের কোনও পরিচয় প্রকাশিত হয় না, সে কাব্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। (বিদ্যাসুন্দরের কোনও পাত্র পাত্রীর যে হৃদয় আছে এমন মনে হয় না। সমগ্র কাব্যে সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই ; কবি মনুষ্যের একটা হেয় প্রবৃত্তির উপর সমস্ত কাব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ; সে ভিত্তি নিতান্ত অশক্ত। তিনি মনুষ্যহৃদয়ের কোন কোমল বৃত্তি ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, কোনও রস এই কাব্যমধ্যে মূর্ত্তিময় হয় নাই, যে হাস্যরস আছে তাহা এত পঙ্কিল যে, নিঃসঙ্কোচে তাহা উপভোগ করিবার উপায় নাই। পতনোন্মুখ মুসলমান জাতি যে জঘন্য রিপুর চর্চ্চাতে জীবন কাটাইত, ভারতচন্দ্র সেই রিপুর প্রবল প্রতাপ ঘোষণা করিবার জন্যই যেন এই কাব্যের রচনা করিয়াছেন, এবং উক্ত রিপুর সম্পূর্ণ বশীভূত একটা পশুরও অধম মনুষ্যকে কালিকার অনুগৃহীত ও শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ও মনুষ্যত্বের অবমাননা, দেবত্বের অবমাননা ও কবিনামের অবমাননা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের শক্তি অল্প ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ ; তাই সেই শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই হৃদয়হীনতার জন্য ভারতচন্দ্র কোনও রসকেই পরিপক্কতা দান করিতে পারেন নাই। আমরা দেখি-

য়াছি যে, করুণ রসের চিত্র কাব্যের ভিতর থাকিলেও তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় বিচলিত হয় না। কন্যার বিদায়ে মা'র হৃদয়ের ব্যথা তিনি স্বচ্ছন্দে "মেয়ে কান্না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। এই স্থলে কবিরঞ্জন ও রায়গুণাকরকে পরাভূত করিয়াছেন। ফলতঃ অনেক বিষয় কবিরঞ্জনের কাছে রায়-গুণাকরের শিক্ষা করিলে ভাল হইত। কবিরঞ্জনের লাঞ্ছিতা প্রহৃতা হীরার হৃদয়ে লাঞ্ছিত সুন্দরের জন্য দুঃখের উদয় হইয়াছিল; ভারতচন্দ্রের হীরার ন্যায় সে সুন্দরের উপর অজস্র গালি বর্ষণই করে নাই। কবিরঞ্জন বিদ্যার বিদায়কালীন ঘটনা ও মনোভাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া কতক পরিমাণে আপনার রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রে ভাব নাই একথা সত্য নহে—তাঁহার কাব্যে ভাবের অভাব নাই, অভাব রসের। তাঁহার কাব্যে আমরা এমন কিছুই দেখিতে পাই না যাহা দ্বারা আমাদের হৃদয় উত্তেজিত, উদ্দীপিত, মর্ম্মাহত বা অভিভূত হইয়া পড়ে। তাঁহার মনুষ্যচরিত্রজ্ঞতা ছিল, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি ছিল না। সেইজন্যই তাঁহার অধিকাংশ চরিত্র আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত—বিশেষতঃ দুঃখের কথা তিনি প্রায়ই অতি সংক্ষেপে কহিয়াছেন। স্নেহ, প্রেম, শোক, দুঃখ, উচ্চাভিলাষ, নৈরাশ্য, কুটিলতা এই সকল মনুষ্যহৃদয়ের বিভিন্ন জাতীয় বৃত্তি ও ভাব, ইহারা সম্পূর্ণভাবে কোথাও তাঁহার কাছে ব্যক্ত হয় নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য-চরিত্র চণ্ডীকাব্যে।

মুকুন্দরামে উপস্থিত হইয়া আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষ্য করি। এখানে আর কিছুই আবছায়া নাই, এখানে মানুষকে মানুষ বলিয়া চিনিতে পারা যায়, এখানে মানুষের যাহা কিছু ক্ষুদ্রত্ব, যাহা কিছু মহত্ব, যাহা কিছু দেবত্ব আছে সবই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে, যে সকল জ্বালা-যন্ত্রণা আছে, যে উচ্চতা আছে, যে নীচতা আছে, ফলতঃ যত কিছু লইয়া মানুষ সংসারে বিচরণ করে, সবই স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত, কবির নিজ কথায় ব্যক্ত নহে, চরিত্র চিত্রিত করিবার সময় নাট্যকলার সাহায্যে ব্যক্ত। কবির কল্পনার চক্ষে যে মূর্ত্তি সমুদিত হয়, তিনি সেই মূর্ত্তিরই একটী নিখুঁত ছবি তুলিয়া রাখেন। মুকুন্দরামের কল্পনা নিজেই সমস্ত কাজ করিয়া রাখে না। পাঠকের কল্পনার জন্যও কিছু কার্য্য রাখিয়া দেয়। কবি কখনও নিজের চরিত্র লইয়া বিচার করিতে বসেন না, তিনি নিজ সৃষ্ট চরিত্রের মুখে যে কথা যখন যেমন স্বাভাবিক হয় ও সাজে, সেইরূপ কথা বসাইয়া যান, নিজ সৃষ্ট চরিত্রের পক্ষে যে কার্য্য স্বাভাবিক তাহাই করাইয়া যায়, যে চিন্তা স্বাভাবিক তাহাই ভাবাইয়া যায়; তারপর পাঠকদিগকে বিবেচনা করিবার অবসর দেন, কোন চরিত্রটী কেমন। তাঁহার চক্ষে ছোট বড় কেউ অবহেলার যোগ্য নহে কেহই উপেক্ষণীয়

নহে। তাঁহার সরল হৃদয় ও শক্তিশালিনী কল্পনা মনুষ্যের কোনও ভাব, কোনও চিন্তা, কোনও অবস্থাকেই তুচ্ছ বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় না। তিনি যখন একটি মনুষ্য বা রমণী সৃষ্টি করেন, তখন তাহার সমস্তটুকু গড়েন কোনও অংশ ছাঁট-ছোট করিয়া, কে কেমন ভাবিবে, কে কি বলিবে বিবেচনা করিয়া একটা সম্পূর্ণ জীবকে অসম্পূর্ণ করিয়া গড়েন না। অবশ্য এ সকল স্ত্রীপুরুষ কবির সময়কার সামাজিক বর্ণে রঞ্জিত হয়, কিন্তু তাহা হইয়াও প্রায় তাঁহার সকল চরিত্রগুলিই চিরন্তন মানুষ। এই সম্পূর্ণতাই কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। এই স্থলেই কবিদ্বয়ের প্রতিভার তারতম্য বুঝা যায়। সময়ের যে দোষ তাহা উভয় কবিতেই বিদ্যমান আছে,—কিন্তু কল্পনাশক্তির ইতর বিশেষ লইয়াই কবিগণের মধ্যে যথার্থ প্রভেদের সূচনা হইয়া থাকে। ভারতচন্দ্র মানুষ গড়িতে চেষ্টা করেন নাই, গল্প বলিয়া গিয়াছেন, গল্পের সঙ্গে যতটুকু মনুষ্যচরিত্র আভাসে ফুটিয়াছে ততটুকুই তিনি ফুটাইয়াছেন, মনুষ্য সৃজন করিবার প্রয়াস তিনি কোথাও করেন নাই। তাঁহার সুক্ষ্ম দৃষ্টি বা সাংসারিক জ্ঞানের বলে অনেক সময়েই আমরা তাঁহার সময়কার মনুষ্যগুলিকে এক রকম সঠিকভাবেই দেখিতে পাই, কিন্তু সে চরিত্রগুলি কোনটাকেই আমরা সম্পূর্ণ দেখিতে পাই না। তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় পাছে পুঁথি বাড়িয়া যায়—পাছে রাজসভায় শ্রোতৃবর্গ বিশেষতঃ রাজা নিজে শ্রান্ত হইয়া পড়েন; রাজকবিগণের এ একটা মস্ত বিপদ। তাহার

উপর কবির চিত্তে কোনও একটা গভীর ভাব স্থায়ী হয় না, চকিতের মত সেই সকল ভাব, সেই সকল চিত্র তাঁহার মনে উদিত হয় এবং অধিক স্থলেই তাহারা হাস্যরসের বন্যায় ভাসিয়া যায়। কবির প্রকৃতি একটু তরল, তিনি হাসিতে পাইলে আর কিছু চাহেন না। মানসিংহের সৈন্য দারুণ ঝড়বৃষ্টিতে ভাসিয়া যাইতেছে—সেই দৃশ্য বর্ণন করিতে করিতে কবি ঘেসেড়ানীর বিপরীত শোক বর্ণনা করিয়া একাকীই হাসিয়া লইয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যে 'চসার'-সৃষ্ট 'ওয়াইফ অফ বাথে'র অবতারণা করিয়াছেন। শিবের রুদ্রমূর্ত্তি বর্ণনা ও দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনা করিতে করিতে ভার্গবের দাড়ি-গোঁফ-বিরহিত মুখ মনে করিয়া হাসিয়া লইয়াছেন। এই হাস্যতরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়া কবি শোক-তাপময় আশা-উত্তেজনাময়, কৌটিল্য-চাতুর্য্যময় ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্বময় মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে দেখিবার অবসর পান নাই, প্রবৃত্তিও বোধ হয় পান নাই। কবি ভারতচন্দ্র প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে শিখেন নাই, তাই তিনি কাঁদাইতেও পারিতেন না। রাজদরবারে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রাজারাজড়ার দিকে বেশী আকৃষ্ট হইয়াছিল তাই তাঁহার কাব্যে বড় ঘরের বড় কথাই বেশী, সহজ মানুষেয় সোজাসুজি কথা, অথবা মনুষ্য চরিত্রের বৈচিত্র্য আমরা বড় দেখিতে পাই না। ইহার উপর তাঁহার যে বিষম উপসর্গ—জগতে মদনের—নির্লজ্জ কামুকতার অখণ্ড প্রভুত্ব, কল্পনা; তাহাতেই তাঁহার সৃষ্টিবিষয়িণী প্রতিভাকে অনেক পরিমাণে ম্লান করিয়া ফেলিয়াছে। ইঙ্গিতে আভাসে

ভারতচন্দ্রে সংসারের বিষয়, মানুষের বিষয় অনেক কথা থাকিলেও, মানুষের মহত্ত্বেরও কতক পরিচয় থাকিলেও আমরা বলি যদি মানুষ দেখিতে চাও, যদি মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইতে চাও তো কৃষ্ণনগরের রাজকবিকে ছাড়িয়া দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবির কাছে চল।

সত্যের খাতিরে এ কথা বলিতেই হইবে যে, মুকুন্দরাম "থোড় বড়ি খাড়া"ই রাঁধুন বা শাক-শুক্তানিই রাঁধুন, সেই পদার্থগুলি তিনি যাহা রাঁধিয়াছেন তাহারই পরিচায়ক অর্থাৎ তাঁহার থোড়কে কেউ খাড়া বলিয়া বা বড়িকে থোড় বলিয়া ভুল করিবে না; অর্থাৎ চপ-কাটলেট খাওয়া মুখে তাঁহার থোড় বড়ি যতই মন্দ লাগুক তাহারা নিজের অস্তিত্ব গোপন করে নাই। তাঁহার কাব্যের জীবগুলি কতকগুলি মতের সমষ্টি বা প্রত্নতত্ত্বের আধুনিক অদ্ভুত উদাহরণমাত্র নহে। কবি ভারতচন্দ্রের আর যতই দোষ থাকুক তিনি সংসার বুঝিতেন, মানুষ চিনিতেন, মানুষের সকল বৃত্তির সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকুক, তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই জানিতেন —নিজের মত-প্রকাশক যন্ত্রবিশেষ বলিয়া ভাবিতেন না। সুখের বিষয় অথবা আধুনিক সমালোচকের মতে দুঃখের বিষয় যে, "বিশ্বজগৎ মুকুন্দরামের হৃদয়ে প্রবেশ যাচ্ঞা" করে নাই, তাই তাঁহার চক্ষু হইতে আমাদের শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিটি অপসৃত হইয়া যায় নাই, আর সেই বঙ্গভূমির সন্তান বাঙ্গালী—ছোট হোক বা বড় হোক—যেমন ভগবান তাহা-

দিগকে গড়িয়াছিলেন—তাহাদের হৃদয় হইতে বিতাড়িত হইয়া পর হইয়া যায় নাই, ভারতচন্দ্র একটু বাবু বনিয়া গিয়াছিলেন, এই তাঁহার দোষ; কিন্তু মুকুন্দরাম খাঁটি বাঙ্গালীই ছিলেন এবং বাঙ্গালীর সবটুকুই ভালবাসিতেন, তাই আমরা তাঁহার কাছ হইতে বাঙ্গালী চরিত্রের যত কিছু জানিতে পারিয়াছি কোনও ঐতিহাসিকের কাছে জানিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালীর জীবন, বাঙ্গালীর চরিত্র, তাঁহার প্রতিভার বলে আমাদের নয়নের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

আজিকালিকার সভ্য পাঠকবৃন্দের অনেকেই হয় ত শিহরিয়া উঠে, ব্রাহ্মণ কবি মুকুন্দরামের কাব্যের নায়ক কিনা একটা তুচ্ছ ব্যাধ! অত হোমরা-চোমরা নায়ক থাকিতে, অত রূপসী ষোড়শী থাকিতে কি না কাব্যের নায়ক-নায়িকা হইল—একটা ব্যাধ দম্পতি? ইহাতে কি কাব্যে সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইতে পারে, না ইহাকে সাহিত্য বলা সম্ভব হয়?

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কোনও ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা বা বিচার করিবার ইচ্ছা করি না। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইহা হইতে যে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমাদিগের বিচারে প্রয়োজন নাই। আমরা ইহার উত্তর দিব অন্য দিক দিয়া। কবির শক্তিমাহাত্ম্য প্রচার করা উদ্দেশ্য—ছোটকে বড় করা শক্তির কার্য্য। অতএব কবির কাব্যের নায়ক নীচ ব্যাধ একথা বলিলে অবশ্য ঠিক কথাই বলা হয় এবং এ একটা ন্যায্য কৈফিয়ৎ

বটে, কিন্তু এই উত্তরই আমি যথেষ্ট মনে করি না। দিল্লীশ্বরের শক্তি যথেচ্ছাচারিণী ও তাহার ইচ্ছায় ছোট বড় হইত ইহা ঐতিহাসিক সত্য হইলেও এ উত্তর এক্ষেত্রে সমস্ত সংশয় দূর করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। যাঁহারা কোনও না কোনও একটা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাইলেই সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা এ ব্যাখ্যাতে তৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই কাল-কেতুর উপাখ্যান হইতে আমার মতে যে ঐতিহাসিক সত্যের অনুভব হয়, তাহা অন্যরূপ তাই আমরা সাহিত্যের লক্ষণ ধরিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্যদর্পণ-কার কাব্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সে লক্ষণ ধরিয়াও কবিকঙ্কণের কাব্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্যগুলি অলঙ্কার-শাস্ত্র-কথিত নিয়মানুসারে গঠিত হয় নাই, তাহার অনেকটা গীতি সাহিত্যের ধরণে লিখিত, প্রভেদ এই যে ইহারা পদ্যে বিরচিত এবং বেশীর ভাগই জনসাধারণের সমক্ষে চামর-মন্দিরার সাহায্যে গীত হইবার উপযোগী করিয়া বিরচিত হইয়াছে। অতএব এ গুলিতে আমরা মহাকাব্যের অনেক লক্ষণই খুঁজিয়া পাইব না, কিন্তু সকল প্রকার কাব্যের একটী সাধারণ লক্ষণ আছে "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"। আমরা সেই লক্ষণ অনুসারে আমাদিগের আলোচ্য কবিগণের কাব্য বিচার করিতে ইচ্ছা করি।

যাহা আস্বাদযোগ্য তাহাই রস। এই ব্যধদম্পতির চিত্রে আস্বাদযোগ্য বস্তু কিছু আছে কিনা তাহাই এখন আমরা দেখিব। সাহিত্যে আস্বাদযোগ্য বস্তু প্রধানতঃ মনুষ্যহৃদয়ের সত্যপ্রকাশ। মনুষ্যের হৃদয় যে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত না হয় সে সাহিত্য রসবিবর্জ্জিত হইতে বাধ্য। কিন্তু মনুষ্যহৃদয় এমন একটা রহস্যময় ব্যাপার যে ইহার সত্যপ্রকাশকালেই কবির যথার্থ পরিচয় পাইবার সুবিধা হয়। অনেক কবি মনুষ্যহৃদয় ভুলিয়া গিয়া নিজের মত অথবা একটা কল্পিত আদর্শ নির্ম্মাণ করিতে বসেন। পুত্রশোকে কাঁদে না এমন মা কি কেহ দেখিয়াছেন? কিন্তু কোনও কবি সে দৃশ্যও আঁকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কারণ তখন তিনি মায়ের মাতৃত্ব ভুলিয়া গিয়া একটা মস্ত আদর্শ গড়িবার সংকল্পে আত্মহারা। ইহা সৌন্দর্য্য নহে বিকৃতি। যাহা বিকৃত অসত্য তাহা যতই উচ্চ সুরে গীত হউক, তাহা যতই বড় ভাবব্যঞ্জক হউক, তাহা দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয় না। সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা সংযমে, সংযমের প্রতিষ্ঠা সত্যে। যে মাতৃস্নেহ ভগবান রমণী-হৃদয়ের সার স্নেহ অমূল্যরত্নস্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার উচ্ছেদ যে রমণী করিতে পারে সে রমণী নহে, হয় সে পিশাচী নয় তো রাক্ষসী। শোকের সংযম সম্ভবপর, কিন্তু পুত্রশোক ভুলিয়া অন্যকে প্রবোধ দেওয়া, নিজের পুত্রনাশে অপরের শোক দূর করিবার চেষ্টা করা শুধু অসম্ভব নহে, অসুন্দর। অনেকে বুঝিতে পারেন না যে, চিত্তবৃত্তির সংযম এক দিকে যেমন সুন্দর, চিত্ত-

বৃত্তির উচ্ছেদ তেমনি অসুন্দর, চিত্তসংযম যেমন আবশ্যক ও উপকারী, স্বাভাবিক বৃত্তির বা ভাবের বিনাশ-সাধন-প্রবৃত্তিরও সংযম তেমনি আবশ্যক। এ কথাগুলি একটা উদাহরণস্বরূপ বলিলাম। ফলতঃ মনুষ্য তাবৎই মনুষ্য থাকে যাবৎ তাহার মনুষ্যসুলভ বৃত্তিসকল লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বাল্মীকি কৌশল্যার বা দশরথের রামবিয়োগ-শোক বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, রামের সীতা-বিয়োগ-দুঃখও বর্ণনা করিতে বিরত হন নাই। মহাকবি কালিদাস কণ্বের হৃদয়কে শকুন্তলা-বিচ্ছেদ-কাতর দেখাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। মহাযোগী মহাদেবকেও অবস্থার সবিশেষ সংস্থানবশতঃ "কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্য" বলিতে লজ্জিত হন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, যাহা স্বাভাবিক তাহা সুন্দর, চিত্তবৃত্তি থাকা অসুন্দর নহে, তাহার অসংযমই অসুন্দর। বৃত্তি আছেই, তাহাকে দমন কর, ইন্দ্রিয় আছে তাহাকে নিগ্রহ কর; বৃত্তি লোপ করিলে ইন্দ্রিয় একেবারে উচ্ছেদ করিলে তাহার সংযমই বা কি আর নিরোধই বা কি? কাষ্ঠ-প্রস্তরের ইন্দ্রিয়-বিকার নাই, ইন্দ্রিয় সংযমও নাই এবং কাজেই সংযমে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় তাহাও তাহাদের নাই। একদিকে ইন্দ্রিয়ের উন্মত্ত উল্লাস যেমন কুৎসিৎ, অপর দিকে ইন্দ্রিয়-বিনাশও তেমনি অসম্ভব, অতএব অসুন্দর। কবি যখন সৃষ্টি করিবেন তখন যদি নিজের মনের ভাব উচ্ছ্বাস অথবা নিজের মনগড়া আদর্শ বা মত না ভুলিতে পারেন তবে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র একটা অলীক বর্ণে চিত্রিত

হইবে। ছোট বড় গুণের সমষ্টিতে মানুষ, যিনি সেই মানুষের কেবল ছোট দিক দেখান, তিনিও যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যিনি কেবল বড়দিকটাই দেখাইবার চেষ্টা করেন, অথবা সেই বড় দিকটা আবার বাড়াইয়া টানিয়া একটা প্রকাণ্ড আদর্শে দাঁড় করাইতে চাহেন, তিনি হয় মানুষটিকে পশুতে, নয় একটা নির্জীব অসত্য আকাশ-কুসুমে পরিণত করিয়া ফেলেন। এ সংসার কিন্তু তেমন নয়, সংসারে ভালও আছে মন্দও আছে, এ ভালমন্দতে মিশামিশি হইয়াই মনুষ্যের চরিত্র। যদি মন্দ না থাকিত তাহা হইলে ভালর "কদর" কেহ বুঝিত না। সাহিত্যেও তাই মন্দেরও স্থান আছে, ভালর পাশে ভালর মহিমা প্রকাশের জন্য। 'কুমারসম্ভবে' মদনের আবির্ভাব আছে ভস্ম হইবার জন্য, বিকারের আবির্ভাব আছে নিগৃহীত হইবার জন্য। যদি মদনই না থাকিত ও বিকারই না আসিত ত মদন-ভস্মের সাত্ত্বিকতা ও ইন্দ্রিয়বিকার চিত্তবলে নিরোধ করিবার সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসিত? অতএব সাহিত্যে সুন্দর ও অসুন্দর পাশাপাশি থাকিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সাহিত্যের দরবারে কেবল রাজারাজড়াই বসিবে তাহার কোনও লেখাপড়া নাই, ইহাতে যে কোনও নীচ-ব্যবসায়ী আসিতে পারে না অথবা কোনও দীন-দরিদ্রের প্রবেশাধিকার নাই এমন কোন কথাও নাই। মানুষমাত্রেরই এখানে আসিবার অধিকার আছে, এবং মানুষ যদি যথার্থ মানুষ হয়, তাহা হইলে তো আছেই, শুধু অধিকার নয়, তেমন মানুষের সাহিত্যের

দরবারে যথেষ্ট প্রয়োজন ও উপকারিতাও আছে। ব্যবসায় কর্ত্তব্যার্থে কৃত হইলে, তাহা যাহাই হোক তদ্দারা ব্যবসায়ীর অপমান নাই। মহাবীর ইপামিনাণ্ডাস রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কোনও অপমান বোধ করেন নাই। মহাভারতে ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান আছে এবং সে যে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার অধিকারী তাহাও কথিত হইয়াছে। আমরা ইহাতে জানি যে, অনেক নীচ ব্যবসায়ী ধর্ম্মশিক্ষকের পদে সহজেই উন্নীত হইয়াছেন, পৌরাণিক যুগে নহে এই যুগেই। কবীর, রুইদাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। অতএব ব্যাধ হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে কোনও বাধা নাই ব্যাধ হইলেও এ সংসারে তাহার একটা বিশেষ কার্য্য আছে, জগতে ঐ শক্তির মহিমা-প্রচার। দারিদ্র ত ভারতবর্ষে কখনও অনাদৃত হয় নাই, এখন বোধ হয় হইতেছে। কারণ এখন আমরা অর্থোপাসক ইউরোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি। ইউরোপীয় কাব্যে দারিদ্র্যের সমাদর নাই, তাহা আমরা জানি, কিন্তু ভারতবর্ষীয় কবির কাছে, বিশেষতঃ মুকুন্দরামের যুগের কবির কাছে দারিদ্র্য একটা বিশেষ আদরণীয় দোষ ছিল না। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, নীচ ব্যবসায়ী ও দরিদ্র বলিয়া কাহারও কাব্যের নায়কত্বে বাধা হইবার প্রয়োজন নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে নীচ ব্যবসায় ও দরিদ্র বলিয়া কাহারও নায়কত্বে বাধা জন্মিতেপারে

না। কিন্তু নীচ ব্যবসায় ও দারিদ্র্যই মুকুন্দরামের এ কাব্যের নায়কের নায়কত্বের হেতু নহে। কালকেতু ও ফুল্লরা কাব্যের নায়ক ও নায়িকা, দরিদ্র এবং হীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত বটে, কিন্তু ইহাদের চরিত্রে যে সৌন্দর্য্য আছে, তদ্দারাই তাহারা কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্য ও দেবত্বের নিকট সম্পর্ক দেখাইবার জন্য কবি তাঁহার নায়ক ও নায়িকাকে শাপভ্রষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব বিশ্বনাথ কবিরাজও এখানে কবির ছল ধরিতে পারিবেন না। "তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ" ঠিক আছে। বলা বাহুল্য যে কবি কোনও আদর্শ গড়িতে বসেন নাই; তিনি কোনও একটা মস্ত গোছের স্বপ্ন দেখিয়া তাহা কুস্বপ্নে পরিণত করেন নাই। তাঁহার যে সরল ও প্রবল বিশ্বাস ছিল—মা যাহার প্রতি কৃপা করেন সে সকলই পায় ও মা যাহার প্রতি বিরক্ত হন সে সকলই হারায়—শুধু এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি কাব্য প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি যে উপাখ্যান দ্বারা এই তথ্য সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন সেই উপাখ্যানে যে মনুষ্য-চরিত্রগুলি তাঁহাকে আঁকিতে হইয়াছে, তাহা তিনি সরল কল্পনার বলেসম্পূর্ণ করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন।

তাঁহার প্রথম উপাখ্যানের নায়ক 'কালকেতু' ধর্ম্মকেতু নামক একজন ব্যাধের পুত্র। তাহার মা নিদয়া দেবীর প্রসাদে

এই পুত্রটী লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার চরিত্র যতটুকু কবি দেখাইয়াছেন তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ সুগৃহস্থ, সম্পন্ন গৃহস্থ নয়, কিন্তু তথাপি অতিথি-সৎকারাদি কার্য্যে রত। ইহাদের ঘরে দেবীর ইচ্ছায় শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রকুমার নীলাম্বর কালকেতুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। কালকেতুর শিক্ষাদি যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ব্যাধের উপযুক্ত শিক্ষা; কালকেতুর খেলাধূলা বীর্য্যবান তেজস্বী বালকের মত। তাহার বিদ্যা ধনুর্ব্বিদ্যাতেই প্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যাধ বলিয়া কথিত হইলেও এই ব্যাধনন্দনের সংস্কারাদি উচ্চ জাতির মতনই হইয়াছিল। ইহার নামকরণ, কর্ণবেধ, বিবাহাদি সংস্কার. বৈদিকমতে সম্পন্ন হইয়াছিল, অতএব বোধ হয় এই ব্যাধজাতি তখন নিতান্ত ঘৃণিত ছিল না; কিন্তু ইহাদের ব্যবসায় যে অসম্ভ্রান্ত ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অতএব সেই ব্যবসায়ের উপ-যোগী শিক্ষাই কালকেতু পাইয়াছিল। কালকেতু যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইতে না হইতে তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল ও তাহার বিবাহ হইল। এই বিবাহ-ব্যাপার কবি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস যেমন অজ ও মহাদেবের বিবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ কবিকঙ্কণও করিয়াছেন। কবি কোন অঙ্গটীই বাদ দেন নাই; ঘটকালি হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের শেষ বর কন্যার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত সব খুঁটিনাটিই তিনি বর্ণনা৷৷

করিয়াছেন। ইহারই ভিতর ঘটকের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিও তুলিয়া রাখিয়াছেন; সে মূর্ত্তি এখনও আমাদের চক্ষে প্রায়ই পড়ে। বিবাহ-উৎসবে কাহার আনন্দ, কাহার ব্যথা, কাহার উৎসাহ সকলই কবির এই চিত্র মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রে পাই না কেবল কালিদাসের সুন্দর উপমাগুলি; না থাকাই সম্ভব, কারণ অজ ও ইন্দুমতী এবং শিব ও গৌরীর সম্বন্ধে যে উপমা প্রয়োজন বা উপযুক্ত তাহা একটী ব্যাধ ও একটী ব্যাধনারীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিলে শোভা পাইত কিনা সন্দেহ। কবি একটি নিত্য-ব্যবহৃত উপযুক্ত উপমা ঘটকের মুখে বসাইয়াছেন:—

সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥

উপযুক্ত কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ ঘরে আনিয়া ব্যাধদম্পতী এখন নিশ্চিন্ত মনে পুত্রের প্রতি সংসার নির্ব্বাহের ভার দিয়া পুরাণাদি ধর্ম্মকথা শ্রবণে সাধুসঙ্গে জীবনপাত করিতে লাগিলেন।

কালকেতু এমন বাপমার ছেলে অতএব তাহার বেশী বিদ্যা না থাকুক তাহার ধর্ম্মে মতি ছিল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ছিল, জনকজননীর উপর ভক্তি ছিল। তাহার পত্নী ফুল্লরাও কর্ত্তব্যপরায়ণা। কালকেতু মৃগয়া করিয়া পশু আনিত, ফুল্লরা সেই সকল পশুর মাংস হাটে বিক্রয় করিত ও তদ্দ্বারা যে অর্থাগম হইত তাহা হইতে ভোজন-সামগ্রী কিনিয়া বাটী ফিরিত। বাটী ফিরিয়া

রন্ধন করিয়া শ্বশুর-শ্বশ্রূকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইত। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্র ও "কুলধর্ম্মরক্ষণের হেতু" "গৃহকর্ম্মে দর" বধূ পাইয়া ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার কাল বড় সুখেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু এ সুখের মোহে আবদ্ধ হইয়াই তাহারা থাকিল না, শেষ বয়সে এমন পুত্র ও পুত্রবধূকে ত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থ কাশীধামে চলিয়া গেল, এই সামান্য ব্যাধদম্পতীর মনে ধর্ম্ম-পিপাসা সাংসারিক সুখকে পরাস্ত করিল। পিতৃমাতৃবৎসল পুত্র ও তাহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাদের বিচ্ছেদে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, বেশভূষা ত্যাগ করিল এবং মাসে মাসে 'সম্বল' যোগাইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল। এতদিন ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার সংসার ছিল, এখন কালকেতু ও ফুল্লরার সংসার হইল, কালকেতু ও ফুল্লরা ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার সৎশিক্ষায় অনেক পরিমাণে সংশোধিতচিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে লাগিল।

সংসার চলিতে লাগিল; আগেকার মতন কালকেতু মৃগয়া করিয়া আনে, ফুল্লরা তাহা বাজারে বিক্রয় করে এবং সঞ্চিত ধন হইতে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু এই সামান্য অর্থ হইতে সংসার-যাত্রা অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হয়; উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না; রোজ আনে রোজ খায়, কালকেতু ত আজকালকার লুচির ফুল্কা খাওয়া সৌখীন বাবু ছিল না, তাহার খাই-খরচটা বড় বেশী; কবি কহিয়াছেন—

শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিটক্যাল।

সাহসী কবি নিজ কাব্যের নায়কের এমন ভাবে বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি কালকেতুর ভোজন বর্ণনা করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে ফুল্লরার স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ফুল্লরা এমন গৃহিণী, সে কেমন করিয়া স্বামীকে আদর-যত্ন করিত, কেমন করিয়া স্বামীর সুখ অন্বেষণ করিত, সকলি কবি দেখাইয়াছেন; একটি সমগ্র সাংসারিক চিত্র উন্মোচনার্থ কবি এই ভোজন-ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর সংসারে দারিদ্র্য কেন ঘোচে না তাহার ইহাই একটা মস্ত কারণ। ফুল্লরার দরিদ্র সংসার, কিন্তু অশান্তির সংসার নহে। অশান্তি নাই বলিয়া দুঃখ নাই তাহা নহে। অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী; অন্নচিন্তায় ফুল্লরা সর্ব্বদাই কাতরা স্ত্রীজাতির চিরবাঞ্ছিত সাজ-সজ্জা তাহার কিছুই নাই, তাহাতে কি তাহার মনে খেদ নাই? খেদ আছে, তাহা কবি ঢাকেন নাই; ফুল্লরা তপস্বিনী নহে, ঋষিপত্নী নহে, সে সামান্য ব্যাধরমণী, সৎশিক্ষা বশতঃ পতিসেবাপরায়ণা, অতএব এত দুঃখেও আত্মহারা নহে। মুকুন্দরাম অস্বাভাবিক আদর্শ সৃজন করিতে জানিতেন না তাই ক্ষুদ্রা ব্যাধরমণীকে সর্ব্বাবস্থাতেই নিজের অদৃষ্টে সুখী করেন নাই। উপবাসচিন্তা ফুল্লরাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা করিয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তে ফুল্লরা কায়মনোবাক্যে সতী হইয়াও নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছিল। ফুল্লরার তৈল বিনা কেশ রুক্ষ, বসন-ভূষণ বিনা অঙ্গ শোভাহীন, তাহার ঘর একটি তালপাতায় ছাওয়া কুড়ে ঘর, বর্ষার বৃষ্টি আটকায় না, অর্দ্ধেক

দিন ক্ষুদকুঁড়া নয় আমানি খাইয়া দিন কাটে। ফুল্লরার দুঃখ কবি “বারমাস্যায়” সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। এমন অবস্থা-তেও যদি ফুল্লরা নিজের অদৃষ্টে ধিক্কার না দিত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতাম যে, সে রক্ত-মাংসের শরীরযুক্তা রমণী নহে। কালকেতুর সংসারের দারিদ্র্য কবি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন-কালে ও তাহার সখীর কথোপকথন কবি কাব্য ভুলিয়া নাটক লিখিয়া ছেন।

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সম্বল উপায়।
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া সেঙ্গাতি ভেট খাও তুমি তথা॥

ইহাতে দুই জনের কথোপকথন আছে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না বোধ হয়। এইরূপ—

আশাসিয়া আইস আইস কহে তার সই।
এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই॥
সই! বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥

প্রথম কয় ছত্রে ফুল্লরার প্রশ্ন ও কালকেতুর উত্তর এবং দ্বিতীয় ছত্রচতুষ্টয়ে ফুল্লরার সখীর প্রশ্ন ও ফুল্লরার উত্তর লিপি-বদ্ধ হইয়াছে; কবি মানসচক্ষে ইহাদের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, কল্পনার কর্ণে তাহাদের বচনগুলি শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই

সেই কথাগুলি যেমন শুনিতেছিলেন তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, একটা যে আর একটার উত্তর সে কথা বুঝাইয়া বলিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না। রিক্তহস্তে প্রত্যাগত স্বামীকে দেখিয়া ফুল্লরার মূর্ত্তি ও তাহার মনের ভাব, তাহার কথোপকথন ও কার্য্য, কালকেতুর কথা ও কার্য্য কবি প্রত্যক্ষ ও কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। দুই সখীর বহুকাল পরে মিলন, দুইজনের আনন্দ কবি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন ও অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। সেক্ষপীয়র কালিদাসের মত কবিকঙ্কণ এ বিষয়ে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি যে চিত্র আঁকেন তাহা স্পষ্ট দেখিয়া থাকেন।

আমরা দেখাইয়াছি যে, ফুল্লরার এক মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-নিয়তিতে ধিক্কার দিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছিল। যে কারণ বশতঃ তাহার এই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণে কালকেতুর মনেও আপন অদৃষ্টে ধিক্কার দিবার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। "অন্ন-চিন্তা ভয়ঙ্করী" তাহাকেও অভিভূত করিয়াছিল কোন্ সংসা-রীকে না করে? তাহার চিন্তা ও তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানি কবি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমাদের চক্ষে জল না আসিয়া থাকিতে পারে না।

দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতি আশে।
আজ কি কহিব যায়্যা আমি তাহার সকাশে।
তৈল লবণের কড়ি ধার ছয় বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান ধারি দুই আড়ি॥

কিরাত পাড়াতে বসি না মিলি উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সহে ভার॥
এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
কিবা সুখ পাইতে আমি আইনু মরতে॥
সুকৃতি পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু।
দুঃখভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু॥

এমন দুঃখের সংসার, কিন্তু অশান্তির সংসার নহে, কারণ দুই জনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, তাই দারিদ্র্য-নিবন্ধন পরস্পরের উপর কাহারও বিদ্বেষ নাই, উভয়ের ভিতর মনোমালিন্য নাই। এত দুঃখেও ফুল্লরা জানিত যে—

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখমোক্ষ-দাতা॥

সকলের উপর সুখ তাহার স্বামীর চরিত্রে বিশ্বাস; সে জানিত যে, তাহার স্বামী দরিদ্র হইলেও সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ; সে জানিত যে, তাহার স্বামীর স্নেহে তাহার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। এইজন্য কালকেতুর সংসার দারিদ্র্যের হইলেও অশান্তি ছিল না। এই অশিক্ষিতা ব্যাধরমণী যে হাড় মাংস বিক্রয় করিয়া খায় সেও আমাদের চিরস্মরণীয়া সতী-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত অবস্থার বিভেদে হয় তো সে আদর্শ একটু খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি ফুল্লরার চরিত্রে

ভারতবর্ষের রমণীর একটী জীবন্ত ছবি উঠিয়াছে। বোধ হয় ভারতবর্ষের বলা ঠিক হইল না, কারণ প্রেমময়ী রমণী জগতের সর্ব্বত্রই এমনিই নির্ভরশীলা ও বিশ্বাসবতী।

কিন্তু আজ এই বড় দুঃখের দিনে বুঝি দুঃখিনী ফুল্লরার সে সুখও ঘুচিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি যে স্বামীর পরামর্শমত সে সখীর বাটী হইতে ভোজ্যদ্রব্য ঋণ করিতে গেল এবং তাহার স্বামী তাহার পরিবর্ত্তে হাটে মাংস বিক্রয় করিতে গেল। সখীর বাটী হইতে ফিরিয়া ফুল্লরা দেখিল তাহার পর্ণকুটীর রূপের জ্যোতিতে আলোকিত—এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী তাহার কুটীর আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সে তাহাকে প্রণাম করিয়া সবিস্ময়ে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহার উত্তরে জানিতে পারিল যে, সে ব্রাহ্মণ-কন্যা, সপত্নীর জ্বালায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং কিছুদিন তাহার গৃহে থাকিতে চায়। কি সর্ব্বনাশ! তাহায় মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; শেষে কি স্বামীর স্নেহেরও বখরাদার জুটিবে? সে যদি তখন জানিতে পারিত যে, আজ তাহার বড় সৌভাগ্য তাহা হইলে তাহাকে অত কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু অভয়া তাহার সহিত আজ একটু পরিহাস (Practical joke) করিতে বদ্ধপরিকরা, তাই সে জানিল যে, কোন গৃহস্থবধূই পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া তাহার গৃহে বাস করিতে আসিয়াছে। অতএব তাহার মুখ খুলিল, অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়া সে সেই অভ্যাগতাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল—শেষ

তাহার সহিত গিয়া তাহার শাশুড়ী-ননদকে বুঝাইবার ভার পর্য্যন্ত লইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সুন্দরী কোট করিয়া বসিলেন যে, তাঁহার আর সতীনের জ্বালা সহ্য হয় না; তিনি এই খানেই থাকিবেন—

"কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তোমার ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুঃখ।
দিয়া আপনার ধন তুষিব বীরের মন
আজি হৈতে পাবে বড় সুখ॥

* * * *

খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি
আমাকে ত না বাসিহ ভিন্।
সমরে কানন ভাগে থাকিব বীরের আগে
আজি হৈতে সম্পদের চিন্॥"

কিন্তু সম্পদের লোভে ফুল্লরার মন টলিল না, সে সুন্দরীকে আবার বুঝাইতে লাগিল—

তোরে দেখি যে উত্তম জাতি. দেবতা সমান কাঁতি
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ, কেন আইলে পরবাস
আপনার কি সাধিলা মান॥
যদি সতিনী কোন্দল করে, দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষপান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥

অবলা অধম জাতি যদি থাকে একরাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
ছল ধরে বন্ধুজন. লোকে করে গঞ্জন
অবিচারে কৈলে অনুচিত ॥

কথাগুলি খাঁটি সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। ফুল্লরার চরিত্রের একাংশ কবি এইরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই উপদেশ দিয়া ফুল্লরা অনেক পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিল। উকীল যেমন একটা তর্ক উত্থাপিত করিয়াই তাহা নজীরের দ্বারা সমর্থন করিতে উৎসুক হয়, ফুল্লরাও তেমনি নিজের কথা পৌরাণিক কাহিনীরূপ নজীর দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু ভবী ভুলিবার নয়। অভ্যাগতা এবার নূতন বোল ধরিল ;—

ফুল্লরা সুন্দরী শুন ফুল্লরা সুন্দরী।
আইলাম বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি ॥
কুলের বহুরী আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি ॥
মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ।
আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বাঁধি নিজগুণে ॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥

আইলাম তোমার ঘর 'হত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারে বারে ॥

কথা একবর্ণও মিথ্যা নহে—যথার্থই বীর আজ নিজের "গুণে" এই সুন্দরীকে বাঁধিয়া আনিয়াছে; অভয়ার পরিহাস-রসিকতা মুকুন্দকবি অনুভব করিয়াছেন এবং অভয়ার সহিত লুকাইয়া হাসিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরামের হাস্যরস নির্ম্মল আনন্দময়; ইহাতে কোন কুপ্রবৃত্তির সংস্পর্শ থাকে না।

মা হাসিতে থাকুন, এদিকে ফুল্লরার মাথায় বজ্রাঘাত; 'বীর বাঁধিয়া আনিয়াছে নিজগুণে' শুনিয়া তাহার প্রাণ ছটফট করিতেছে, তাই এই নবীনা অতিথিকে তাড়াইবার জন্য সে এবার উপদেশ ছাড়িয়া নিজের অবস্থা বিবৃত করিতে লাগিল; বার মাসে যে তাহার কত দুঃখ তাহা বিনাইয়া, বিনাইয়া নানা ছাঁদে বর্ণনা করিল; আশা, যদি এই দুঃখের কথা শুনিয়া "মাগী" ভয়ে পলায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সেও যেমন ধনের লোভে প্রলোভিত হইবে না, সে স্ত্রীলোকও তেমনি নাছোর বন্দা, তাহাকে ধনের অংশ না দিয়াও ছাড়িবে না। এদিকে যে ফুল্লরার একমাত্র শান্তির কারণ, এই দুঃখ-সাগরের একমাত্র তরণী স্বামীর প্রতি বিশ্বাস, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ফুল্লরা আজ যথার্থ দুঃখিনী। তাহার দুঃখের আজ সীমা নাই, যখন কিছুতেই রমণীকে বিদায় করিতে পারিল না এবং সেই সুন্দরী যুবতী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছে বলিয়া জোর করিয়া আত্মীয়তা পাতাইয়া নিজ ধনের অংশ দিতে চাহিতেছে,

তখন তাহার মনে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল—তবে বুঝি সত্যই তাহার স্বামী এই রূপসীকে লইয়া আসিয়াছেন। তাহার এতদিনের বিশ্বাস এতদিনের ভক্তি সব ভাঙ্গিয়া গেল; সে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সন্ধানে বাহির হইল। ফুল্লরা দেশী—খাঁটি স্বদেশী মেয়ে বলিয়া স্বামীর উপর সন্দেহবশতঃ ভ্রমরের মত গৃহ ত্যাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল না, রমোলার মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল না, অভিমান বশীভূত হইয়া সহজে বুদ্ধিটুকু হারাইয়া বসিল না। সে তাহার সন্দেহের মীমাংসার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামী সমীপে উপস্থিত হইল। স্বামীর সহিত বিবাদ স্বামীর সহিত মিটানই ভাল—স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকু তাহার ঘটে তখনও বিদ্যমান ছিল। যে রমণীর সেই বুদ্ধিটুকু লোপ পায় তাহার অনেক দুর্দ্দশা ঘটে, আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলে, এবং **Mrs. Henry Wood** (মিসেস হেনরি উড) তাঁহার ঈষ্টলীন নামক গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন।

এদিকে কালকেতু ফুল্লরাকে কাঁদিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।—

শাশুড়ী ননদী নাহি নাই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব কর্যা চক্ষু কৈলি রাঙা॥

ফল্লরার উত্তরও তেমনি নির্ভীক ও স্বাভাবিক—

সতাসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরার হৈল বিমুখ বিধাতা॥

কি দোষ দেখিলে প্রভু আজিকার স্বপনে।
দোষ নাহি দেখা কেন কর অপমানে॥
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন।
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পালখ উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরবার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥

পত্নী স্বামীর কাছে মনের জ্বালায় কথা কহিতেছে, সে স্থলে ছেঁদো কথার স্থান নাই, তাই কথাগুলি সহজ ও সরল। স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক তাহাতে আজ কথা ঢাকিবার অবসর নাই, ফুল্লরাকে স্বামীর নৈতিক চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে, অতএব সে নির্ভীকভাবে স্বামীকে তাহার পাপ-প্রবৃত্তির জন্য অনুযোগ করিল, তাহার ফলাফল বিবৃত করিয়া বুঝাইল। কিন্তু এই কথাগুলি শুনিয়া সত্যনিষ্ঠ সরল ধার্ম্মিক কালকেতুর ক্রোধের সীমা রহিল না; তাহার চিরসঙ্গিনী স্ত্রীর মুখে একি কথা। কালকেতু সভ্য পত্নীভক্ত প্রজা নহে, কাজেই কথাবার্ত্তা কায়দাদোরস্ত নহে,সে পাঁচটা দিব্য খাইয়া অথবা পাঁচটা মিথ্যা কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিল না; তাহার উত্তর দৃপ্ত, সতেজ ও নৈতিক বলের পরিচয়ে—আদৌ মোলায়েম নহে। ব্যাধযুবকের উপযুক্ত, সভ্য বাবুর যোগ্য নয়—

পরস্ত্রী দেখিয়া যেন নিদয়া জননী ॥
বেকত করিয়া বামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়ারে কাটিব তোর নাসা ॥

ব্যাধযুবকের চরিত্রের মহত্ত্ব কোথায়—কেন সে একটা কাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাধের মুখে যেমন কথা সাজে এ তেমনি কথা, কিন্তু এই কথাগুলি হইতে যে একটী সবল নৈতিক সচ্চরিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, সূর্য্যালোক যেমন সমস্ত সংসারকে আলোকিত করে তেমনি কবিকঙ্কণের সমস্ত কাব্যটীকে সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য যদি আমাদের চরিত্রে থাকিত, তাহা হইলে আজ আমাদের এত দুর্দ্দশা হইত না।

যাক, এখন আমরা আবার এই ব্যাধদম্পতীর অনুসরণ করিব। কালকেতু ক্রোধ করিল বটে, নিজের চরিত্রে এমন দোষারোপ শুনিলে কাহার না ক্রোধ হয়? কিন্তু হঠকারিতা এই দম্পতীর চরিত্রে ছিল না, তাহাই সে স্ত্রীর সহিত, তাহার কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য হাট হইতে পসরা তুলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। গৃহে আসিয়া দেখে সত্যই তে:

আপনার বাসে।
তিমির কেটেছে যেন তপন তরাসে ॥
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখান করে ঝলমল।
কোটী ভানু প্রকাশিত আকাশমণ্ডল ॥

অপূর্ব্ব দৃশ্য—অপূর্ব্ব অবসর। এই রূপের খনি—সৌন্দর্য্যের মণি—অযাচিতভাবে তাহার কুটীরে উপস্থিত, দরিদ্রের ঘরে ঐশ্বর্য্যের ডালি লইয়া, যুবকের ঘরে রূপযৌবনের উপহার লইয়া আত্মনিবেদন করিতে উৎসুক হইয়াছে। কালকেতু স্বাধীন, কালকেতু দরিদ্র, কালকেতু যুবক, এমন অবস্থায় রূপের জয় হইবার, প্রলোভনের জয় হইবার পক্ষে একমাত্র বাধা—নৈতিক চরিত্রবল, ধর্ম্মে নিশ্চলা মতি। যে অবস্থায় পড়িয়া জুলিয়স সিজার, মার্ক এণ্টনির মত বীর পুরুষেরা পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়া আজ এই নগণ্য, অন্নচিন্তাপরাহত, যৌবনমদযুক্ত, অশিক্ষিত ব্যাধযুবক, অসার সে ধনের প্রলোভন, রূপের প্রলোভন, যৌবনের আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া যে অপরূপ নৈতিক বলের পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে মনুষ্য মধ্যে উচ্চাসন-প্রাপ্তির যোগ্য। যথার্থ মনুষ্যত্ব জাতিবিচার মানে না, ব্যবসার বিচার করে না। রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত যে মনুষ্যত্ব বশতঃ একটী কাব্যের নায়কত্ব দাবি করিতে পারিয়াছেন ঠিক সেই মনুষ্যত্ব, সেই আত্মসংযম, সেই চরিত্রবল আছে বলিয়াই ক্ষুদ্র ব্যাধ হইলেও কালকেতু কাব্যের নায়ক হইবার উপযুক্ত পাত্র। যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম এই খানে সেই প্রশ্নের মীমাংসা হইল। কেন যে কালকেতু নায়কত্ব-প্রাপ্তির উপযুক্ত এতক্ষণে আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম।

কালকেতুর মনুষ্যত্ব সরল ও স্বাভাবিক, সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের

ফলে প্রসূত; ইহাতে কোনও বিপরীত ভাব মিশ্রিত নাই, ইহাতে কোন কারদানি দেখাইবার ইচ্ছা মিশ্রিত নাই। কাল-কেতুর আত্মসংযম লোক দেখাইার জন্য নহে, লোক ভুলাই-বার জন্য নহে, আত্মপ্রশংসা করিবার জন্য নহে, আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিবার জন্যও নহে। জলে যেমন নিম্নগামিত্ব স্বাভা-বিক, তেমনি কালকেতুর চরিত্রে নিরহঙ্কারিতা স্বাভাবিক, আত্ম-সংযম যেমন স্বাভাবিক, আত্মসংযমের জন্য গর্ব্বের অভাবও যেমনি স্বাভাবিক, কারণ ইহাই এই সরল ধার্ম্মিক যুবকের চরি-ত্রের মাধুর্য্য। আমরা জানি যে, এই ব্যাধের অথবা এই ব্যাধ-চরিত্র প্রণেতা কবির হৃদয়ে বিশ্বজগৎ প্রবেশ যাচ্ঞা করে নাই, কিন্তু আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি যে, যে শুভক্ষণে এই অশিক্ষিত অমার্জ্জিত ব্যাধ যুবক স্বতঃ সমাগত সৌন্দর্য্য এবং অর্থের প্রলোভন অনায়াসে বর্জ্জন করিয়া, সংযমের মাহাত্ম্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন বিশ্বজগৎ একবারে তাহার সমস্ত সৌন্দয্যগ্রাহিণ শক্তি লইয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চাসনে স্থাপিত করিয়া সৌন্দর্য্যাভিষেকে তাহার জীবনের সেই মুহূর্ত্ত-টীকে অনন্ত মুহূর্ত্তে পরিণত করিয়াছিল এবং প্রাচীন কবি মুকুন্দরামকে সৌন্দয্যস্রষ্টা কবিগণের মধ্যে একজন অগ্রণী বলিয়া অকুণ্ঠিত ও আনন্দিত হৃদয়ে বরণ করিয়াছিল।

কবি মুকুন্দরাম যে মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত করেন তাহাতে অসঙ্গতি-দোষ থাকে না। সরলচিত্ত কালকেতু, চিরদিনই সরল, দারিদ্র্যে সরল, ধনী অবস্থাতেও সরল, দরিদ্র যুবক যেমন

ধর্ম্মপরায়ণ, ধনী কালকেতুও সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, পরহিতার্থী, দাতা। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু যেমন সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল, ভূম্যাধিকারী, কালকেতুও তেমনি সকলকার সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ রহিল। কবি মুকুন্দরাম কালকেতুর চরিত্রের পাশাপাশি আরও কয়েকটী চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সকলগুলিই অশেষ কৃতিত্বব্যঞ্জক। সরলতার পাশে তিনি কূটতা দেখাইয়াছেন। ভাঁড়ু দত্ত ইহার মধ্যে প্রধান। ভাঁড়ু দত্ত একজন স্বার্থপর চতুর লোক, ইহার মতন লোকেরা স্বার্থ সাধন করিবার জন্য সব করিতে পারে। ভাঁড়ু দত্তের বিষয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিব। "কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ু দত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে, এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লী করিতে মজবুৎ লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি; তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটীকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। ভাষার এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয় আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ু দত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার ভাঁড়ু দত্তের যতটুকু

আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশী কিছু দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারে ভাঁড়ু দত্ত ঠিক ঐটুকু মাত্র নয়, এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। * * * * কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ু দত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটী সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।"

কবিকঙ্কণের সৃষ্টির ইহাই বিশেষত্ব—ভারতচন্দ্র হইতে তাঁহার প্রভেদ এইখানেই। কবিকঙ্কণের চরিত্রগুলি একটা সমগ্রতার সহিত ফুটিয়া উঠে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্য চরিত্র (চণ্ডীকাব্য)।

কালকেতুর উপাখ্যান পুরুষ-প্রধান। আমরা দেখাইয়াছি যে, এই কালকেতুর চরিত্র একটি উচ্চ সুরে বাঁধা, এই উচ্চ সুর ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ পুরুষ-চরিত্র ভাল আঁকিতে পারেন নাই, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা কালকেতুর চরিত্র হয় বুঝিতে পারেন নাই, নয় বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। অনেকে তাহার ধান্য ঘরে লুকানর প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কালকেতুর চরিত্রে ইহা একটা দোষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার দ্বারাই তাহার সমস্ত চরিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, একথা কেহ যেন না ভাবেন। কালকেতু কোন কালেই শিক্ষিত ছিল না, কবি বরাবরই তাহাকে ব্যাধের চরিত্রেই দেখাইয়াছেন; তাহার স্ত্রীর কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক গৃহ-কোণে লুকান,—স্ত্রৈণতার পরিচায়ক, কাপুরুষতার নহে; কারণ এই লুকাইবার প্রবৃত্তি ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল, আপনিই সে মুহূর্ত্তপরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া কলিঙ্গরাজের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং বন্দী হইয়াছিল। কালকেতু যে ভীরু বা কাপুরুষ নহে, তাহার পরিচয় কলিঙ্গ রাজার সভায়

প্রকাশ পাইয়াছে।—মৃত্যুর করাল ছায়া যাহার সম্মুখে বিস্তৃত সে যদি বলিতে পারে—

বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ॥

তাহাকে কি কাপুরুষ বলা চলে?

কালকেতুর হৃদয় কত উচ্চ ছিল তাহা ভাঁড়ু দত্তের প্রতি পুনর্ব্বার কৃপা-প্রকাশে জানা যায়। যে ব্যক্তি হইতে তাহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, যে এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা ভোগ করাইয়াছিল, তাহারও দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া যায়, সে কত বড় চিত্তবান তাহা ভাবিয়া দেখিলে কি আমরা বলিতে পারি যে, কবিকঙ্কণ পুরুষ-চরিত্র আঁকিতে পারেন নাই? আমরা আধুনিক কাব্যনিচয়ে এমনি একটা সরল ধার্ম্মিক, সংযমী ও হৃদয়বান্ মনুষ্যের চরিত্র দেখিবার জন্য উৎসুক আছি, এমনি একটা সুসঙ্গত চরিত্র চিত্র দেখিতে চাহি, কিন্তু খুঁজিয়া পাই না। আজকালকার কবি একটা ভাব (Idea) ঠিক করিয়া লইয়া তাহাই বুঝিয়া থাকেন, তাহাতে রক্তমাংসের মানুষ হয় না। কেহ বা একটা মত গড়িয়া লইয়া তাহার পর সেই মত সমর্থন করিবার জন্য মনুষ্য-চরিত্র অঙ্কিত করেন; তাহাতে সুসঙ্গত চরিত্র সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। কালকেতু একটী খাঁটি মনুষ্যের চরিত্র, এত সুন্দর ও স্বাভাবিক

যে এই চরিত্র শুধু ভারতবর্ষের মনুষ্য-চরিত্র নহে, ইহা জাগতিক মনুষ্যের চরিত্র; কালকেতু-চরিত্রে যে সকল উপাদান বর্ত্তমান আছে, তাহা সকল দেশের সকল মনুষ্যের চরিত্রকেই উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য দিতে পারে।

(যেমন কালকেতুর চরিত্র, তেমনি ফুল্লরার চরিত্রও স্বাভাবিক ও মধুর। ফুল্লরাও কালকেতুর মত সরলা এবং জগতের সকল সতী স্ত্রীর মত পতিপরায়ণা। দেশের অবস্থা বিশেষবশতঃ তাহার চরিত্রে কুসংসার ও কিছু ভীরুতা প্রবেশ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার সাধারণ চরিত্রের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। সারল্যবশতঃ সে ধূর্ত্তের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, স্বামীর বিপদেই সতীর বিপদ, কিন্তু তাই বলিয়া সে স্বামীর অমঙ্গল কামনা করে নাই। স্বামীর বন্ধনে তাহার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন আমাদেরও হৃদয় বিচলিত করে। করুণরসাবতারণে কবিকঙ্কণ সিদ্ধহস্ত। ফুল্লরার স্বামীর সুখে সুখ, স্বামীর দুঃখে দুঃখ, স্বামীর দারিদ্র্যে দারিদ্র্য, স্বামীর সৌভাগ্যে সৌভাগ্য। ইহাই জগতের সকল সতীর লক্ষণ।) তাই বলিতেছিলাম যে, ফুল্লরার চরিত্র, বঙ্গদেশের ব্যাধ-রমণী চরিত্র বলিয়া কল্পিত হইলেও, ইহাতে সাধারণ রমণীত্ব এমন সুন্দর ও সহজভাবে অর্পিত হইয়াছে যে, এই চরিত্র সকল দেশের সতী নারীর চরিত্রের দর্পণ স্বরূপ হইয়াছে।

(এইরূপ স্বাভাবিক রেখার সাহায্যে মুকুন্দরামের সকল চিত্রই অঙ্কিত। লহনাই বল, খুল্লনাই বল, দুর্ব্বলাই বল আর

লীলাবতীই বল, সুনীলাই বল অথবা তাহার মাতাই বল, সকল চরিত্রই স্বাভাবিক; ধনপতি বা শ্রীমন্ত, জনার্দ্দন ওঝা বা অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিত সকলেই যেন আমাদের চির-পরিচিত।

এ সকল চিত্রেও কবির কোনও আদর্শ-সৃষ্টির বিকট চেষ্টা লক্ষিত হয় না। সমস্ত ঘটনা যেন তাঁহার কাব্যমধ্যে কোনও একটা অনিবার্য্য কারণবশতঃ সংঘটিত হইয়া যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার চরিত্রগুলি যেন আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।] ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার কাব্যের নরনারী-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি, মনের ভাবাবলী যখন যেমন স্বভাবানুযায়ী, তখন তেমনি প্রকাশ পাইয়াছে; তাহার ইতর-বিশেষ করিবার জন্য কবি কোথাও চেষ্টা করেন নাই। খুল্লনা কাব্যের নায়িকা, তাই বলিয়া যে সে সপত্নীর সহিত কলহ করিতে পারে না, তাহা নহে; বরং তাহা করাই সম্ভব, কারণ রক্ত-মাংসের শরীরে রোগ আছেই। স্বামীর গৃহে কোন স্ত্রীই অপমান সহ্য করিতে পারে না, তা সে স্বামীর অন্যা পত্নীর কাছ হইতেই হউক, অথবা অন্য কাহারও কাছ হইতেই হউক। সতীনের ঝগড়া চিরপ্রসিদ্ধ, কোনও স্ত্রী—বিশেষতঃ যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে—সে স্বামীর প্রেমে কোনও অংশীদার সহ্য করিতে পারে না। "ন মানিনী সংসহ্যতেঽন্য সঙ্গমম্' এই সপত্নীবিরোধ ভারতবর্ষে চির-প্রসিদ্ধ, রামায়ণের সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে। মহর্ষি কণ্বকে তাই শকুন্তলাকে উপদেশ দিতে হইয়াছিল "কুরু প্রিয়-সখীবৃত্তিং সপত্নী

জনে”। লহনা যে খুল্লনাকে কুরূপা করিবার জন্য পতির নাম দিয়া পত্র জাল করিয়াছিল, ইহা তাহার বিষম অন্যায় হইলেও ঠিক এইরূপ স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কৈকেয়ী রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়াছিল। লহনার স্বামিহৃদয়রূপ রাজ্য যে অপরে আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে এ যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইল না, তাই লীলাবতীর উপদেশ তাহার ভাল লাগিল না, সে কোট করিয়া বসিল—খুল্লনাকে কুরূপা করিতে হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় স্বামীর উপর তাহার প্রভাব ঘুচিয়া যাইবে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে সে খুল্লনার উপর বিষম অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে ছাগল রক্ষণে বাধ্য করিল। কিন্তু সকল স্ত্রীলোকের মত লহনা বিপরীতগামিনী চিত্তবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাই খুল্লনার প্রতি অত্যাচারও যেমন স্বাভাবিক, খুল্লনাকে সোহাগ করাও তাহার পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। যে স্বামীর ভালবাসার লোভে সে খুল্লনাকে উৎপীড়ন করিয়াছিল, সেই স্বামীর ভালবাসা হারাইবার ভয়েই আবার সে খুল্লনাকে আদর করিতেও পারিয়াছিল, তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেও কুণ্ঠিত হন নাই এবং তাহাকে বাড়াইতেও পারিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ তাহার যথেষ্ট ছিল না যে তাহা নহে

পরের বচনে তারে দূর কৈনু দয়া।
অন্ন-কষ্ট দিয়াছি আপন মাথা খ্যায়া॥

তারপর আবার লহনার মন ফিরিয়া গিয়াছিল—স্বামি-

সমাগমে তখন আবার স্বামীর প্রেমলাভের আশায় এবং স্বামীকে খুল্লনার প্রতি বিরক্ত করিবার জন্য সে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। খুল্লনাকেও অনেক স্তোক-বাক্য বলিয়া স্বামি-সহবাসে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তখন খুল্লনার বুক দশহাত হইয়াছে, সে কি আর লহনাকে ভয় করে? এইরূপে সপত্নীকলহ নানারসে বিভূষিত করিয়া কবি সম্পূর্ণ-ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। খুল্লনার প্রভুত্ব লহনার পক্ষে যে কতদূর অসহ্য ছিল তাহা ধনপতির সিংহল-প্রবাস-প্রস্তাব শ্রবণে লহনার আনন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে খুল্লনার নিরানন্দ, লহনার মহা আনন্দ, তাহার একমাত্র কারণ সে স্বামীর আদরে বঞ্চিত, বিশেষতঃ তাহার কপট ব্যবহার স্বামীর কর্ণগোচর হওয়ার পর হইতে এবং খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইবার পর হইতে স্বামী তাহার প্রতি বিরক্ত ও খুল্লনার প্রতি সেই মাত্রায় বেশী অনুরক্ত। এই বিষম দৃশ্য তাহার সহ্য হয় না, বরং স্বামীর বিচ্ছেদ সহনীয়, কিন্তু তাহার স্বামী যে আর একজনের বশীভূত ইহা সে সহিতে পারে না।

সুয় পরে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা।
আমার দিকে পিঠ প'ড়িলে করে হেট মাথা॥
সুয় দুয় সমান হইল এখন হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল॥

কবি ভারতচন্দ্র এই মনোভাবের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন —

আপনি তো জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়॥

পতি চলিয়া যাইবার পর আবার লহনা খুল্লনার প্রতি দয়াশীলা হইয়াছিল। কিন্তু সে দয়া তার বেশীদিন থাকে নাই, কারণ পতি লইয়া হিংসা ঘুচিতে না ঘুচিতে পুত্র লইয়া হিংসার উৎপত্তি হইল। একে সতীন তাহার উপর আবার তাহার পুত্র বংশের প্রদীপ, এ জ্বালা কি সহজে সহা যায়? তাই লহনা পুত্রের প্রতি তত বিরক্ত না হইলেও পুত্রের জননীর প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল। লহনা কেবল স্ত্রী, খুল্লনা স্ত্রী ও জননী। জননীর স্নেহ জননীর ঔৎসুক্য মা না হইলে কাহারও বুঝিবার উপায় নাই, তাই লহনা শ্রীমন্তের জন্য খুল্লনার ব্যগ্রতা বুঝিতে পারিত না এবং না বুঝিয়া তাহাকে গালি দিত। কবি মুকুন্দরাম খুল্লনার চরিত্রে শুধু পতিপরায়ণা রমণীই আঁকেন নাই, পুত্রবৎসলা জননীও আঁকিয়াছেন। এই চিত্রে মায়ের আনন্দ, মায়ের স্নেহ, মায়ের উৎসাহ, মায়ের ঔৎসুক্য. মায়ের ব্যথা সবই প্রকাশিত হইয়াছে;) এমন সহজ সুন্দর ও সম্পূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি আমরা অন্য কোনও কাব্যে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ; যদি থাকে তো তাহা কুমারসম্ভবে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যকাব্যনিচয়ে মাতৃস্নেহের চিত্র আছে সত্য, কিন্তু সেগুলিও যে সম্পূর্ণ তাহা বলিতে পারিলাম না। অস্বাভাবিক মাতৃমূর্ত্তি কিন্তু আমরা এখনকার কাব্যে অনেক দেখিতে পাই।

আয় আয় রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মুল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগন মণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন চাঁদ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা।
কালি গড়ায়ে দিব সোণার ভেটা॥

ইত্যাদি ঘুমপাড়ান গান হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীমন্তের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত একটী অখণ্ডিত রসের সহিত খুল্লনার মাতৃস্নেহ ফুটিয়া উটিয়াছে, সরল ও সহজ রাগরঞ্জিত হইয়া একটী পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। মা হওয়ার যত সুখ, যত দুঃখ খুল্লনা সবই অনুভব করিয়াছে। অথচ খুল্লনার চরিত্রে বল নাই তাহা নহে, সেই সুন্দর নৈতিক বল ছিল বলিয়া সে 'মা'কে বলিতে পারিয়াছিল—

সেই ছিরা দিয়াছ আপনি,
হাতে তুলি দিয়া নিধি পুন কেড়ে নাও যদি
তবে কি করিতে পারি আমি॥

স্ত্রীজাতির দুর্ব্বলতা, স্ত্রীজাতির মধুরতা, স্ত্রীজাতির ভালবাসা, স্নেহ-মমতা সমস্তটুকু লইয়া কবি এই খুল্লনা-চরিত্র গঠন

করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ণতা আছে বলিয়া খুল্লনা কবির কাব্যের শ্রীমন্তোপাখ্যানাংশের নায়িকা।

চণ্ডী কাব্যের এই অংশে আরও অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র আছে তাহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বলার চরিত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। দুর্ব্বলা মন্থরা-জাতীয়া স্ত্রীলোক, কিন্তু মন্থরা অপেক্ষা ইহার চরিত্র কিছু রহস্যময়। লহনার হৃদয়ের মত দুর্ব্বলা দাসীর হৃদয়ের বৃত্তিও বিপরীতগামিনী। কিন্তু সে খাঁটি দাসী। দুর্ব্বলার চরিত্র আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহি না, কিন্তু এইটুকু বলিতে চাহি যে, এ সকল ছোট ছোট চরিত্রের নিপুণ চিত্রণ দ্বারা মুকুন্দরামের সৃষ্টিকৌশল ও মনুষ্যহৃদয়জ্ঞতা বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় একটা চলিত কথা আছে, "গোদা নড়ী ছাদন দড়ী তুমি কার?" না, "যখন যার কাছে থাকি তখন তার।" দুর্ব্বলা সেই গোদা নড়ী ও ছাঁদন দড়ী। এই দৃঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া কবি ভারতচন্দ্র দুর্ব্বলা দাসীকে দুই ভাগ করিয়া সাধী ও মাধীতে পরিণত করিয়াছেন। এই দুর্ব্বলাই কিন্তু শ্রীমন্তের ধাত্রী, স্নেহশীলা ধাত্রী। শ্রীমন্তের হৃদয়ে তাহার স্নেহ মৃত্যুকালেও জাগরূক ছিল, তাই মশানে বসিয়া শ্রীমন্ত বলিয়াছিলেন—

দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।

* * *

এ সব দুঃখের আদি বুঝাবে দুর্ব্বলা দিদি।

এই সকল পুরাণো ঝি আমাদের চির-পরিচিত, তাই

দুর্ব্বলাকে দেখিয়াই আমরা চিনিতে পারি।) কবি মুকুন্দরামের সূক্ষ্মদৃষ্টি সংসারের চারিদিকেই ধাবিত হইত। তিনি স্বচ্ছন্দে সব চরিত্রই নিপুণভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন। (সেক্সপীয়র যেমন স্বচ্ছন্দতার সহিত **Dogberry** আঁকিয়াছেন, কালিদাস যেমন স্বচ্ছন্দতার সহিত একটী ধীবরের চিত্র আঁকিয়াছেন, কবি মুকুন্দরামও তেমনি অনায়াস লীলা-সহকারে দুর্ব্বলা, লীলাবতী. জনার্দ্দন ওঝা, অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিত, কর্ণধার বাঙ্গাল মাঝি প্রভৃতির চিত্র আঁকিতে পারিয়াছেন। ছোট হইলেও তাঁহার কোন চরিত্রই অসঙ্গত নহে, নির্জ্জীব নহে। যাহার যেখানে হাসিবার কথা সে সেখানে হাসিয়াছে, যাহার যেখানে কাঁদিবার কথা সে সেখানে কাঁদিয়াছে ; যাহার যেখানে যাহা করিবার কথা, সে সেখানে ঠিক তাহাই করিয়াছে ; কবি কিছুই ঢাকিবার, কিছুই উল্টাইবার চেষ্টা করেন নাই। অথচ ইহারই ভিতর হইতে এক একটী সুন্দরভাব এমন সরল রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা সেই সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না।)

(ধনপতির চরিত্র বিচার করিয়া দেখিলেই একথা বেশ বুঝা যাইবে। মুকুন্দরামের সব চিত্রগুলিই গৃহচিত্র, পৌরাণিক চিত্র নহে। দেবতার কথা ও অতিপ্রাকৃত কথা মিশিলেও তাহারা প্রধানতঃ গৃহচিত্র। তাঁহার কাব্যে রাজা রাজড়ার কথা আছে কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য নাই। ধনপতি সম্পন্ন গৃহস্থ, ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থশালী কিন্তু গৃহস্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গৃহস্থ লোক যেমন হয়, সেও তেমনি দোষে গুণে জড়িত। তাহার প্রথম অপরাধ এক পত্নী সত্ত্বে খুল্লনাকে বিবাহ। সমাজে একাধিক বিবাহ তখন প্রচলিত, বোধ হয় বেশী রকমই প্রচলিত ছিল, তাই ধনবান্ ও রূপবান্ ধনপতির খুল্লনাকে বিবাহ করা বড়ই সহজ হইল। কিন্তু এ বিবাহ দ্বারা সে নিজেও সুখী হইতে পারিল না, খুল্লনাকেও দারুণ জ্বালায় ফেলিল। রসিকা খুল্লনার রূপে ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া ধনপতি আত্মহারা হইল সঙ্গে সঙ্গে লক্ষপতি (খুল্লনার পিতা) বরের রূপ, কুল ও ধন দেখিয়া পত্নী রম্ভাবতী তীব্র তিরস্কার ও হিতোপদেশ অবহেলা করিয়া কন্যাকে সতীনের ভয় থাকিলেও ধনপতির করে সমর্পণ করিল। ধনপতির এই বিবাহ রূপের মোহে, প্রাণের টানে নহে ; তাই এ বিবাহে কেহই সুখী হইতে পারিল না। মাঝে হইতে শান্তিময় সংসারে একটা বিষম অশান্তির উদয় হইল ; দুই সপত্নীর বিদ্বেষবহ্নি। অতএব কিছুদিন রূপের সহবাসে তাহার দিন সুখে কাটিলেও, পরিণামে তাহাকে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে খুল্লনারও নির্য্যাতনের সীমা ছিল না।

কবি এই নির্য্যাতন সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই ঘটনার সাহায্যে অনেকগুলি চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধনপতি বিবাহ করিয়া আনিয়া খুল্লনাকে লহনার হস্তে সমর্পণ করিয়া, বিদেশে চলিয়া গেল। সহনশীলা হিন্দু-স্ত্রী লহনা, সপত্নী খুল্লনাকে বড় যত্নে রাখিল,—বড় সুখে প্রতিপালন করিতে

লাগিল। যদি এইভাবে চলিত তাহা হইলে সংসার সুখে চলিত। কিন্তু সংসারে এমন চরিত্রের নরনারী অনেক আছে, যাহাদের প্রাণে পরের সুখ সহ্য হয় না, তাহারা একটা কোন অহেতুক বিদ্বেষবশতঃ লোকের সর্ব্বনাশ না করিতে পারিলে হাঁপাইয়া উঠে।) ধনপতি যখন খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া আনে তখন বোধ হয় এই সকল লোকের অস্তিত্ব সে অবগত ছিল না। তাহার উপস্থিতিতে সংসার এক রকম চলিতে লাগিল কিন্তু যেই সে দূরদেশে গমন করিল অমনি শান্তিময় সংসারে বিষবৃক্ষ রোপিত হইল, অথবা ধনপতির নিজেরই রোপিত বিষবৃক্ষে ফল ধরিল। দুর্ব্বলা দাসীর হৃদয়ে দুই সপত্নীর ভালবাসা সহ্য হইল না ; সে লহনার হৃদয়ে সপত্নীর প্রতি ঈর্ষা বীজ বপন করিয়া দিল। সেই ঈর্ষা-বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফলস্বরূপ খুল্লনার ছেলি বা ছাগল চরান। এই ছেলি-রক্ষারূপ সামান্য ব্যাপার লইয়া কবি মুকুন্দরাম অশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। একদিকে খুল্লনার অশেষ যন্ত্রণা যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, আর একদিকে খুল্লনার হৃদয়ের মধুরতা, তাহার সহ্যশীলতাও তেমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা মুকুন্দরামের চিত্রাঙ্কন-প্রতিভার বিচারকালে এই স্থলের অনেকগুলি চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, কবি কঙ্কণের হৃদয় ভারতবর্ষের সকল মহাকবির মত প্রকৃতির সহিত একটা আশ্চর্য্য সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ। শকুন্তলার মত, উমার মত খুল্লনাও প্রকৃতিকে নিজের সখী, নিজের আত্মীয়া বলিয়াই জানিত। খুল্লনার দুঃখ এত স্বাভাবিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে

তাহা দ্বারা করুণরস যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।) ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালা কাব্যে,—কি আধুনিক কি পুরাতন—এমন সুন্দর করুণরসের চিত্র আর কোথাও দেখি নাই।

(মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের উপাখ্যানে স্ত্রী-প্রকৃতির অধিক সমাদর করিয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র; কারণ উপাখ্যনের প্রথমেই তিনি বলিয়া রাখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের পূজা-গ্রহণাভিলাষে চণ্ডী খুল্লনাকে সংসারে আনিয়াছেন। ধনপতির চরিত্র খুল্লনার চরিত্র পরিস্ফুট করিয়াছে মাত্র; এই চিত্রে আমরা কোন বিশেষ মহত্ত্ব দেখিবার প্রত্যাশা রাখি না। ধনীর সন্তান সাধারণতঃ যেমন হয় ধনপতিও তেমনি। একাধিক বিবাহকারী ব্যক্তির সাধারণতঃ যেমন হওয়া সম্ভব ধনপতি ঠিক সেই প্রকার। কখনও সে এ স্ত্রীকে ভুলাইতেছে, কখনও ও স্ত্রীকে ভুলাইতেছে, কখনও ইহার মন রাখিতেছে, কখনও আবার অন্যের মন রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেবল দুই স্ত্রীর মন যোগাইয়া যদি তাহার দিন কাটিত তাহা হইলে সে একরকম চালাইতে পারিত; কিন্তু লহনার অবিমৃষ্যকারিতায় শুধু খুল্লনাকে বিপন্ন হইতে হইল না, ধনপতিকেও বিষম সমস্যায় পড়িতে হইল। সভায় সম্মান পাইবার অধিকার রূপ ছিদ্র হইতে তাহার স্বজাতীয় বণিকেরা খুল্লনাকে লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। খুল্লনার অপরাধের মধ্যে সে লহনা কর্ত্তৃক ছাগরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল,

অতএব তাহাকে বণিক সভায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ধনপতির তখনও রূপজ মোহ কাটে নাই, কাজেই সে মহা বিপদে পড়িল; খুল্লনাকে বারবার অনুরোধ করিল তাহার পরীক্ষা দিয়া কাজ নাই, সে টাকা দিয়া সকলকে নিরস্ত করিবে। সংসারী লোকে বিশেষতঃ ধনী সংসারী লোকে এমন করিয়াই এইরূপ সামাজিক অত্যাচারের হাত এড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্তু খুল্লনার সুবুদ্ধিবশতঃ ধনপতি এই সামাজিক ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। কবি অবশ্য এই অগ্নিপরীক্ষাসংক্রান্ত ঘটনাগুলি রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে সতী রমণীকে জগৎলক্ষী আদ্যাশক্তি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। খুল্লনার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল ইহার বহুপূর্ব্বেই। যখন সুন্দরী যুবতী লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা খুল্লনা একাকিনী বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও কায়-মনোবাক্যে পতিপরায়ণা থাকিতে পারিয়াছিল, তখনই তাহার যথার্থ অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল। খুল্লনার সামাজিক পরীক্ষা জগতের সমক্ষে তাহার পবিত্রতা প্রচার করিয়াছে মাত্র। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় সতীত্ব পরীক্ষার অনেক রকম উপায় সকল সমাজেই প্রচলিত ছিল। তাহার মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা একটী।[১] সেক্ষপীয়রের সমসাময়িক নাট্যকার মিড্‌লটন তাঁহার চেঞ্জলিং (পরিবর্ত্তনশীলা) নামক নাটকে সতীত্বপরীক্ষার এক ঔষধের কথাও লিখিয়াছেন। তাহার বিবরণ বড় কৌতুক-ময়। [ইংলণ্ডে অগ্নিপরীক্ষা (Trial by fire) তৃতীয় হেন্‌রীর

আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে মুকুন্দরামের সময়ও এইরূপ পরীক্ষার প্রচলন ছিল তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক, ধনপতি খুল্লনার সৎসাহস ও বুদ্ধির প্রভাবে আবার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল।

ধনপতি খুল্লনার সৎসাহস ও বুদ্ধির প্রভাবে সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভের পর কবি ধনপতিকে সিংহলে পাঠাইয়াছেন এবং সিংহলে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহার চরিত্রের এক সুন্দর ভাগ দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ধনপতি একজন ইষ্টনিষ্ঠ সরল ভক্ত। ধনপতির ইষ্টদেবতায় মতি এত দৃঢ় যে ইহার জন্য সে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা খুল্লনার সহিত মনোমালিন্য করিতে কুণ্ঠিত নহে। এই সরল ভক্তির প্রভাবে সংসারী ধনপতি সহসা একজন মানুষের মত মানুষ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। শক্তি ছাড়িয়া শক্তির উপাসনা হয় না, তাহা তখনও ধনপতি শুনে নাই সত্য; কিন্তু এ ভ্রান্তি থাকিলেও তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা অনেকটা 'মারটার' [martyr]এর মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছে। ধনপতির সিংহলে যাইবার পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সে সকল ঘটনা হইতে এইটুকু বুঝিতে পারি যে, ধনপতি জীবনের প্রতি যথেষ্ট মমতাবান্ ছিল; হইবারই কথা; সে রূপবান্,যৌবনশালী,ধনী ও সুখী; গৃহে দুই ভার্য্যা, তাহাদের মধ্যে একজন পুত্রসম্ভবা রূপবতী ও গুণবতী। এমন অবস্থায় জীবনে কাহার না মমতা হয়? এইরূপ জীবনে আস্থা,

প্রাণভরা আশা লইয়া ধনপতি সিংহল রাজ্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং তাঁহার কাছে স্বচক্ষে দৃষ্ট কমলে-কামিনীর বর্ণনা করিল। সে অবশ্য জানিত না যে, ইহা মহাশক্তির প্রপঞ্চ মাত্র; অতএব নির্ব্বিবাদে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, কমলে-কামিনী না দেখাইতে পারিলে দ্বাদশ বৎসর কারাগারে বাস করিবে। রাজা স্বদলবলে কমলে-কামিনী দেখিতে গেলেন, কিন্তু কমলে-কামিনী তখন অন্তর্ধান করিয়াছেন, অতএব ধনপতি রাজাকে সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে, তাহার একান্ত যন্ত্রণাপ্রদ কারাবাস ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন ঘটিল। দারুণ যন্ত্রণাকর কারাগারে ধনপতি বন্ধনদশায় অবস্থিত, এমন সময় মহামায়া তাহাকে স্বপ্ন দিলেন, "মহামায়াকে পূজা কর, তোমার বন্ধন মুক্ত হইবে, ধন ফিরিয়া পাইবে, আবার সুখ পাইবে। না করিলে তোমার নিস্তার নাই, খুল্লনা হাটে সূতা বেচিবে, তুমি অশেষ কষ্ট পাইবে।" ধনপতির উত্তর যথার্থ ভক্তবীরের মত—

যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজিব যদি নৃপ কারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥

এই উত্তর শুনিলেই আমাদের হৃদয়ে আর একজন মহা-ভক্তের কথা মনে আসে। যবন হরিদাস কৃষ্ণভক্তি-অপরাধে যবনরাজ-করে অশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও এমনি সতেজ

উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কবির মনে সেই মহাপুরুষের চিত্র সম্ভবতঃ উদিত হইয়াছিল। ধনপতি সংসারী, সংসারীর সকল দোষগুণ তাহার ছিল; তবু এরূপ উত্তর তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কবি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, ধনপতি নির্গুণ নহে—

যেন রূপ তেন গুণ উত্তম বেভার।
দেব দ্বিজ গুরুভক্ত শুদ্ধ সদাচার॥
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য যাহার অভ্যাস॥

অতএব তাহার চরিত্রে এমন ভক্তি বা ইষ্টনিষ্ঠা দেখিলে আমরা বিস্মৃত হই না, বরং মনুষ্যহৃদয়ের বৈচিত্র্য অনুভব করিয়া আশান্বিত হই। মনুষ্যত্ব—পশুত্ব ও দেবত্বের সমষ্টি। একটী মনুষ্যের চরিত্রেই পশুত্ব ও দেবত্ব এত পাশাপাশি এবং এমন আশ্চর্য্যভাবে সংমিশ্রিত থাকিতে পারে, এবং এমন বিস্ময়জনকভাবে তাহাদের বিকাশ হয় যে, অনেক সময় আমরা সহসা বুঝিতে পারি না যে, এরূপ হওয়াও সম্ভব। মনুষ্য-হৃদয়ের এই বৈষম্যময়ী বৃত্তি যিনি যথাযথ চিত্রিত করিতে পারেন তিনিই যথার্থ চিত্রকর। ধনপতির চরিত্রের এই উচ্চতা তাহার রূপজ মোহের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, অথচ তাহার এই দৃঢ়ভক্তি তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই কবি দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরাম জানিতেন যে, মানুষ শুধু দৈহিক বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মাত্রেরই সমষ্টি নহে, এই সকলের সহিত

তাহার আত্মা কার্য্য করিতেছে, দৈহিক বৃত্তির কার্য্য ও আত্মার কার্য্য সমান ভাবের নহে ; অনেক সময়ে বিপরীত পথাবলম্বী, তাই তিনি যেমন একদিকে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য দেখাইয়াছেন অপর দিকে তেমনি আত্মার কার্য্যও দেখাইয়াছেন। তিনি একটি মানুষকে সম্পূর্ণভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। মুকুন্দরামের সংসারাভিজ্ঞতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, তাই তিনি সংসারের জীবগুলিকে তাহারা যেমন ঠিক তেমনি দেখিয়াছেন তিনি ধনপতির দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মা—এ সকলেরই খবর লইয়া ধনপতিকে চিত্রিত করিয়াছেন। ধনপতির ইন্দ্রিয়বিকার আছে, কিন্তু ধনপতি হৃদয়হীন নহে, কবি তাহাকে পরের জন্য কাঁদাইতে পারিয়াছেন। বাঙ্গাল মাঝির পরিবারের জন্য সে দুঃখিত। মুকুন্দরাম কেবল কামের চিত্রই আঁকেন নাই ; রূপজমোহ দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহারই সঙ্গে আত্মার কাছে এই মোহের পরাজয়ও দেখাইয়াছেন। ধনপতির প্রবল সংসারাসক্তি ও প্রাণের মায়া আছে, সংসারে তাহার অশেষ সুখের সম্ভাবনা আছে, সে প্রাণ রাখিতে চাহে। কিন্তু অতুল সুখ, সুখময় প্রাণ, দারুণ যন্ত্রণার ভয়, এ সকল তাহার দৃঢ় ভক্তিকে টলাইতে পারে না, সেই একনিষ্ঠতার পরিবর্ত্তে সে প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে। এই ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ত্বের সমষ্টি ও রহস্যময় সংমিশ্রণে মানুষ, মানুষ। মানুষ একদিকে যেমন নিরবচ্ছিন্ন পশু নহে, অপরদিকে তেমনি কেবল আদর্শ চরিত্র লইয়া বিচরণ করে না।

এ সংসারও ঠিক তেমনি রহস্যময়। এখানে যেমন হাসি আছে তেমনি ক্রন্দন আছে, যেমন দুঃখ আছে তেমনি সুখও আছে, দুই পাশাপাশি চলিয়াছে। ধনপতিকে কারাগারে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াই কবি স্বচ্ছন্দচিত্তে খুল্লনার সাধ ভক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম দৃঢ়ভক্তি দেখাইয়াছেন, অথচ সেই দৃঢ়ভক্ত ধনপতিকেও বিপদে ফেলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহামায়ার ইচ্ছাই যে সংসারে প্রবল, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। মহামায়ার ইচ্ছাতে ধনপতি খুল্লনার প্রতি আসক্ত, আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই সে তাহার প্রতি বিরক্ত। মহামায়ার ইচ্ছাতেই সে বিপদ্‌গ্রস্ত আবার তাঁহারই কৃপায় সে বিপন্মুক্ত ;) যতদিন মহামায়ার কৃপা না হইয়াছিল ততদিন সে শক্তি বিচ্যুত শক্তিকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। যখন তাঁহার কৃপা হইল তখন তাহার জ্ঞানচক্ষে শক্তিসমন্বিত শক্তের আবির্ভাব হইল। নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর তাহাকে রূপ, ধন, মান দিতে পারেন নাই, শক্তির কৃপাতে সে আবার সব ফিরিয়া পাইল। কিন্তু এই যে মহামায়ার লীলা, ইহা মনুষ্যের চক্ষে অনেকটা রহস্য-ময়ী। অনেকে তাহাকে খামখেয়ালীও বলিতে পারেন। তাই যে সময়ে ধনপতি শক্ত ও শক্তির সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া শরীর, মন, আত্মা পবিত্র করিতে পারিল, ঠিক সেই সময়েই কবি মহা-মায়ার দ্বারা তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করাইলেন, এ অপহরণ ধনরত্নের তুচ্ছ অপহরণ নয়, একেবারে তাহার কাছ হইতে তাহার প্রিয়তমা পত্নী খুল্লনা, প্রিয়তম পুত্র শ্রীমন্ত ও তাহার

ছুই পত্নীকে চিরকালের জন্য অপহৃত করাইলেন। মহামায়ার ইচ্ছা ভিন্ন ইহার আর কোন কারণ নাই। সংসারে এমন ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে, কবি তাহা জানিতেন। এ সকল ঘটনায় মহামায়ার শাপ ও মহামায়া কর্তৃক শাপ বিমোচন ভিন্ন অন্যকোন কারণই নাই, তাহা আমরা কতবার লক্ষ্য করিয়াছি। আমাদের বুদ্ধিতে সংসারের এই গভীর রহস্য অধিকাংশ সময়েই বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী শক্তির খামখেয়ালি এবং অবিচার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, কিন্তু ভক্ত কবি মুকুন্দরাম ইহাতে মায়ের ইচ্ছা স্পষ্ট দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে থাকিতে পারিয়াছেন।

(ধনপতির চরিত্র ও শ্রীমন্তের চরিত্র তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, মহামায়ার ইচ্ছাই জগতে প্রবল। শ্রীমন্ত সরল, বুদ্ধিমান্, উদযোগী বালক—জননীর সুশিক্ষায় মহামায়ার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাসশালী। এ চরিত্রটী একটী সরল রেখায় অঙ্কিত, ইহার ভিতর কোনরূপ মারপেঁচ নাই। এই সরলস্বভাব ধীসম্পন্ন বালকের চারিধারে কবি আরও অনেকগুলি চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের সবগুলি এই চরিত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। বালক শ্রীমন্ত মহামায়ার স্নেহের ধন—কবি মুকুন্দরামের প্রিয় মানসপুত্র; কিন্তু তাই বলিয়া সে শান্ত “শিষ্ট” “গোবেচারা”—আজকালকার বাঙ্গালী ছেলের গর্ব্বের বিষয় নহে; সে বিলক্ষণ দুষ্ট ও খেলার সাথীদের নাকাল করিয়া আনন্দ অনুভব করে। খেলায় যে খুব মজবুত, বাল্যকালে সব খেলাই তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু

বালক খেলিতেও যেমন মজবুত পড়িতেও তেমনি; যখন পড়ায় মন দিল তখন তাহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে অল্প-কালেই বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিল। শুধু বিদ্যাশিক্ষা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তিও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই জিজ্ঞাসা ব্যাপার লইয়াই শ্রীমন্তের জীবনস্রোত পরি-বর্দ্ধিত হইল। একদিকে স্বায় সরল প্রশ্নের গুরু-কৃত "কৃষ্ণের ইচ্ছা"-রূপ সমাধান অসন্তুষ্ট, পুনঃ প্রশ্নকারী তীক্ষ্ণবুদ্ধি জিজ্ঞাসু বালক, অপরদিকে সেই প্রশ্নের মীমাংসায় অসমর্থ অসংযত-চিত্ত তেজস্বী গুরু অসঙ্গত উচ্ছৃঙ্খল ভাষায় শিষ্যতাড়নকারী চপলস্বভাব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; এই দুই চিত্র কবি স্বাভাবিক ভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কবি ব্রাহ্মণের পতন উজ্জ্বল বর্ণে দেখাইয়াছেন। এই অসংবৃত্ত চিত্ত ব্রাহ্মণ শুধু শিষ্যকে অকারণ মনঃপীড়া ও কুৎসিত গালাগালি দিয়া ক্ষান্ত হইল না, তাহার জননীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিল। জনার্দ্দন ওঝা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত নহে, বার্দ্ধক্যসুলভ কোপনস্বভাব ও আত্মাভিমান তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সে এই দুই দোষের বশবর্ত্তী হইয়া নিরীহ বালকের হৃদয়ে বিষ ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয়েও সে কুৎসা-কালকূট ঢালিয়া দিয়া তাহার জ্বালা নিবারণ করিল। যেমন জনার্দ্দন-চরিত্র, তেমনি তাহার স্ত্রী-প্রতিরূপ লহনা। সেও মায়ের প্রাণের ঔৎসুক্য ও ব্যথা বুঝিতে না পারিয়া খুল্লনাকে যথেষ্ট মর্ম্মপীড়িত করিতে ছাড়িল না—ঈর্ষা বড় নির্ম্মম,

বড় কুৎসিত।) ওথেলোর সুখ দেখিয়া ঈর্ষা প্রপীড়িত, ইয়াগো রাগের কোনও কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিল "I hate the Moor" (আমি মুরকে ঘৃণা করি)। লহনার মনেরও ঠিক সেই অবস্থা। (কবি লহনার মুখে যে গালি বসাইয়াছেন তাহা লহনারই উপযুক্ত, জনার্দ্দন ওঝার মত সভ্য ভাষায় প্রযুক্ত নহে মুকুন্দরাম নাট্যকার, তাঁহার পাত্রগুলি যেমন কথা কয় তিনি ঠিক সেই রকম লিখিয়া থাকেন ;—

"উহার হাতে রাঙা শাখা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে সুতের মা॥"

এই সকল কথার ভিতর হইতে হিংসা বহ্নি ধক্ ধক্ করিয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক গুরুর এই বিষময় বাক্য শ্রীমন্তের চরিত্রে বিশেষ পরিস্ফুটই হইয়াছে—তাহার বিশেষ উপকারই সাধিত করিয়াছে। গুরুর এই অভ্য ব্যবহারে, সুখের কোলে পালিত, মাতৃস্নেহের নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন ও পিতার উদ্ধারসাধন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। মায়ের প্ররোচনা রাজার উপদেশ কিছুতেই তাহার সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিল না। ইহার ফলে শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক ধনপতির উদ্ধার সাধন হইল।) কবি এই মধুর-হৃদয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালকের চরিত্র বড় করুণ, বড় সরলভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার সুখে আমরা সুখী হই, ইহার দুঃখে আমরা দুঃখী না হইয়া

থাকিতে পারি না, শ্রীমন্ত আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়ে। ইহার কাতরতায় কঠিনহৃদয় কোতোয়ালেরও হৃদয় দ্রব হয়, ইহার ছোট ছোট দুর্ব্বলতাগুলিও আমাদের মিষ্ট লাগে। যেতটুকু পর্য্যন্ত এই মিষ্টত্ব থাকিতে পারে কবি মুকুন্দরাম সেই পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াই শ্রীমন্তকে কাব্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। শ্রীমন্ত সংসারে থাকিয়াও সংসারের ধূলা কাদা মাখে নাই—ইহার ধূলা-কাদা-মাখা মূর্ত্তি দেখিতে আমাদের ভাল লাগিত না—কবির সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহা দেখিতে পাইয়াছিল।

শ্রীমন্তের চরিত্রের আশেপাশে কবি আর কতকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন এবং কতকগুলি চরিত্র পুষ্টও করিয়াছেন। রাজা শালিবাহন তাহার মধ্যে একজন। এই চরিত্রটী বোধ হয় কবি তৎকালীন কোন অত্যাচারী ভূম্যধিকারীর চরিত্র দেখিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, অথবা ইহাতে হয়ত ডিহিদার মহম্মদ শরিপের চিত্রের ছায়াপাত হইয়া থাকিবে। স্বার্থপর অত্যাচারী রাজার একটী নিরীহ বালককে বধ করিবার যেরূপ উৎসাহ, যে কোন অছিলা করিয়া পরস্বাপহরণে যেমন আগ্রহ—আবার, চাপ পড়িলে বাপ' বলিতেও তেমনি আগ্রহ। এইরূপ ক্ষুদ্রচেতা লোক আমরা সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাই। ধনপতি ইহার ও ইহার রাজ্যের লোকের যে বর্ণনা করিয়াছে তাহার একবর্ণও মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। এই ব্যক্তি শ্রীমন্তকে অসহায় দেখিয়া তাহার শত করুণ বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রাণহরণে উদ্যত হইয়াছিল, আবার তাহাকে শক্তির অনুগৃহীত

দেখিয়া তাহার চরণে কন্যা উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। শ্রীমন্তের বিবাহ লইয়া কবি বহুবিধ রসের অবতারণা করিয়াছেন —তন্মধ্যে করুণ রসই প্রধান। সুশীলার মাতার চিত্রটী বড় মনোরম। বলা বাহুল্য, কন্যা বিদায়ে জননীর ক্রন্দন এত করুণ ও এত স্বাভাবিক যে, স্বভাবতঃ করুণ রসাবতরণে সিদ্ধহস্ত কবি এই ব্যাপারটীকে "মেয়ে কান্না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে জামাতাকে আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য রাজারাণীর নানাবিধ কৌশল ও বাক্‌জাল সৃজন কবি সুন্দর ও নির্ম্মল হাস্যরসের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুকুন্দ কবির হাস্যরস কোথাও পঙ্কিলনহে ইহা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা উপভোগযোগ্য। মুকুন্দরামের হাস্যরস কোথাও ভাঁড়ামিতে নামে নাই। বরঞ্চ আমরা দেখিতে পাই যে, মুকুন্দরাম অধিকাংশ স্থলেই মনুষ্য-চরিত্রের কোন উপহাস্য বা নীচ অংশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা তাঁহার হাস্যরস নিপুণভাবে করুণরসের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সেক্সপীয়রের মতন তাঁহার হাস্য-রসিকতা (Humour, সংসারকে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার ফলে বৈচিত্রময়ী। যে হাস্যরসের সাহায্যে তিনি মুরারি শীল, বা ভাঁড়ুদত্ত অথবা দুর্ব্বলা দাসীর সৃষ্টি করিয়াছেন,—সে হাস্যরস, খুল্লনার ধনপতির সহিত প্রথম সাক্ষাতে যে হাস্যরস ফুটিয়াছে, অথবা ফুল্লরার সহিত ভগবতীর কালকেতুকে লইয়া পরিহাসে যে হাস্য বিকশিত হইয়াছে কিম্বা উল্লিখিত রাজরাণীর কৌশল-বিস্তারে যে হাস্যরস

দেখা যাইতেছে, তাহারা সকলেই বিভিন্ন জাতীয়, মনুষ্য-হৃদয়ের বিভিন্ন বৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের নানা অবস্থার নানা ভাব অবলম্বনে প্রসূত।) সমগ্র মনুষ্য চরিত্রের উপর এই প্রশস্ত ও বিশদ শান্ত দৃষ্টিই মহাকবির লক্ষণ এবং ইহা দ্বারাই কবি-কঙ্কণের মনুষ্যচরিত্রের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে। (বাঙ্গালীর সংসারে কন্যার বিদায়, বিজয়ার মহামায়ার প্রতিমা বিসর্জ্জনের মত একটি অব্যক্ত ব্যথার সৃজন করে; সেই ব্যথার সহিত এই হাস্যরসের মিশ্রণ বৃষ্টির সহিত রৌদ্রের সম্মিলনের ন্যায় অশ্রু ও হাসি দুই লইয়া বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু এত আদর, এত কৌশল, শ্বশ্রূর বিলাপ বিদ্রূপ, শ্বশুরের অনুরোধ, পত্নীর সোহাগ বহুবিধ আমোদের প্রলোভন কিছুতেই শ্রীমন্তকে বশীভূত করিতে পারিল না। আজ তাহার হৃদয় মাতৃ-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় এত লালায়িত যে, সে স্বচ্ছন্দে এই নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিল। সে বুঝিয়াছিল—

যার মা থাকে সে আনন্দে প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সংসার না জুয়ায়।)

আজ আমরা সেই সুন্দর ভাব ভুলিতে বসিয়াছি কিসের লোভে? কিসের লোভে আমরা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে পর করিয়া "বাঙ্গালী চরিতে"র পত্নীভক্তির আদর্শ হইয়া উঠিতেছে? হায়! বাহ্য চাকচিক্যময় বিলাতী সভ্যতা তোমার আপাত-মনোরম ভৌতিক আলোকে আমাদের চক্ষু এত আকৃষ্ট হইয়াছে যে,

আমরা নিজত্ব ভুলিয়া অনলাভিমুখী পতঙ্গের ন্যায় তোমার কবলিত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি। আমরা আজকাল সকলেই জ্যেষ্ঠ, সকলেই সমাজ-সংস্কারক, সকলেই বচন-বাগীশ প্রায় সকলেই ভাই ভগ্নী ফেলিয়া শ্যালক শ্যালিকাকে মাথায় করিতে শিখিয়াছি। এই অন্ধকারে শ্রীমন্তের মাতৃভক্তি,—পিতৃভক্তি আমাদের কি অল্প আলোকও দিতে সক্ষম হইবে না? কোনও সমালোচক দুঃখ করিয়াছেন যে, কবিকঙ্কণের পুরুষ-চরিত্রগুলি নিজের বলে দাঁড়াইতে পারে না এবং কবিকঙ্কণ ভাল বিষয় পাইয়াও শিল্পীর ন্যায় তাহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। কথাটা কি সত্য? একথা সত্য বটে কবিকঙ্কণের পুরুষগুলিই বল, স্ত্রীগুলিই বল সকলেই প্রথমে না হউক শেষ পর্য্যন্ত দেব-শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যথার্থ ভাবিয়া দেখিলে ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস করা ভিন্ন আর কোনও পথ আছে কি? কিসের জন্য পিতৃ-উদ্ধার ব্রতে ব্রতময়ী কর্ডিলিয়াকে সেক্সপীয়র মারিয়াছেন? কিসের জন্য পতিচিন্তাময়ী শকুন্তলাকে কালিদাস অত কষ্ট দিয়াছেন? তাঁহারা বুঝিবেন যে, জগৎপরিচালিনী ঐশীশক্তির অচিন্ত্য রহস্যের সর্ব্ব সময়েই বেশ বিশদব্যাখ্যা করা যায় না, সে রহস্য সর্ব্বদাই আমাদিগের বুদ্ধি ও চিন্তাকে পরাভূত করিয়া আপনার কার্য্যসাধন করিয়া চলিয়াছেন। ঠিক এই কথাই মুকুন্দরাম তাহার কাব্যে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট নরনারীরাও নিজ নিজ অদৃষ্টলিপির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছে, ফলাফল চণ্ডীর ইচ্ছা অনুসারে হইয়াছে।

বালক শ্রীমন্ত নিজের ইচ্ছাতেই পিতার উদ্ধার-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; সে সময়ে কে তাহাকে প্ররোচিত করিতে আসিয়াছিল? বিপদে পড়িয়া সে মা বিপদতারিণীকে স্মরণ করিয়াছিল, সেটা কিতাহার চরিত্রের দোষ। পিতার উদ্ধার সাধন না করিয়া সে চণ্ডীরও অনুরোধ রক্ষা করে নাই; এই অটল প্রতিজ্ঞাই তো শ্রীমন্তের চরিত্রের মূল ভিত্তি। ধনপতি যে এত বিপদগ্রস্ত হইয়াও অনায়াসে চণ্ডীর প্রলোভন উপেক্ষা করিল; ইহা কি চরিত্রের নিজের বলে দাঁড়ান নহে?

আখ্যানবস্তুর ব্যবহারে শিক্ষা—কৌশল আছে কি না আমাদের অতটা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিকঙ্কণের কাব্য ঘটনা-পরম্পরা স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে। মনুষ্য-চরিত্রের বিকাশ কবির প্রধান লক্ষ্যস্থল। তাঁহার আখ্যান বস্তুর সুব্যবহারের (Plot interest) প্রতি তত সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে না, সেক্সপীয়রেরও এই দোষ আছে। (Furnival) (ফার্ণিভাল) বলিয়াছেন—

"In the construction of his dramas Shakespear's weak-ness seems to me to spring from his strength. That was characterisation. Give him a story that afforded scope for development of character, and he did not care much for a plot ....Shakespeare cared for life and did not bother himself about subject, object, idea, teleology, &c,"

অর্থাৎ সেক্সপীয়রের নাটকগুলিতে যে দোষ আছে তাহা

তাঁহার গুণ হইতে প্রসূত হইয়াছে—সে গুণ তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা। মনুষ্য-চরিত্র বিকশিত করিতে পারা যায়—এমন একটী গল্প পাইয়া তিনি আখ্যান-বস্তুর সজ্জার জন্য চিন্তিত হইতেন না। তিনি মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি দেখিতে—বিষয়, উদ্দেশ্য, ভাব বা কার্য্যকারণাদিকে গ্রাহ্যই করিতেন না।

আমরা এই নিবন্ধ মধ্যে যতদূর সম্ভব দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছি যে, মুকুন্দরামও মনুষ্যচরিত্রের বিকাশের প্রতিই আস্থাবান্ ছিলেন। ইহা হইলেও আমি এমন বিবেচনা করি না যে, মুকুন্দরাম তাঁহার আখ্যান-বস্তুর নিতান্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমন্তোপাখ্যানের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গল্পটীতে অসঙ্গতি কোথাও আছে কি? পিতৃবৎসল পুত্র পিতার উদ্ধারের জন্য বহুকষ্ট সহ্য করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিল। দুঃখাবসানে এত সুখের মাঝেও তাহার দুঃখিনী জননীকে মনে পড়িয়া গেল, সে আর দেশে না গিয়া থাকিতে পারিল না। কোন প্রকার অনুরোধ বা প্রলোভন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; তাহার পর পিতাকে স্বদেশে আনিয়া তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-সঞ্চার দেখিয়া সে ধন্য হইল। আর তাহার জীবনের কার্য্য বাকী রহিল না —কবি তাহাকে সংসার হইতে সরাইয়া লইলেন। দুই পত্নীর কথা অনেক কাব্যে আছে, কিন্তু কোন্ কবি তাহার ভিতর হইতে একটী খুল্লনার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন? আমি বুঝিতে পারি না, যে শিল্পীর মত আখ্যানবস্তুর ব্যবহার কেমন করিয়া

করিতে হয়। বোধ হয় দুই একটা খুন খারাপি, এক আধটা আত্মহত্যা প্রভৃতি না থাকিলে আজকালকার হিসাবে আখ্যানটা সম্পূর্ণ বা জমকালো হয় না। অন্ততঃ গোটাকতক নিরাশ প্রণয়ের-হা-হুতাশ থাকা তো চাই-ই।

(শ্রীমন্তোপাখ্যানের শেষভাগে উপস্থিত হইয়াও আমরা কবির চরিত্র-চিত্রণ-ক্ষমতারও সূক্ষ্মাদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাই। কবি শ্রীমন্তকে যে স্থলে উপস্থিত করাইয়াছেন, সে স্থলে আসিয়া শ্রীমন্ত সংসারের পঙ্কিল ধূলি মাখিবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সামাজিক নিয়মবশে সে একাধিক বিবাহ করিয়াছে। যদি কবি শ্রীমন্তকে আর অধিক দিন সংসারে রাখিতেন তাহা হইলে শ্রীমন্তের আর এক মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখিতে হইত, কিন্তু নিপুণ শিল্পী মুকুন্দ কবি ঠিক এই সময় শ্রীমন্তের জীবনের উপর যবনিকা ক্ষেপণ করিয়াছেন। যাঁহারা চরিত্রের বিকাশ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা লহনার অভিমানেরও খুশালার অভিমানের মধ্যে যে যে সূক্ষ্ম বিভেদ আছে, এবং ধনপতি কর্ত্তৃক লহনার অভিমান শান্তি ও শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক সুশীলার অভিমান শান্তির ভিতরেও যে পার্থক্য আছে তাহা অনুভব করিয়া সুখী হইবেন। যে পর্য্যন্ত শ্রীমন্তের চরিত্রের মিষ্টত্ব নষ্ট হয় নাই—সেই পর্য্যন্ত কবির এই কাব্যে শ্রীমন্তের প্রয়োজন আছে, ইহার পর আর তাহার প্রয়োজন নাই।)

কিন্তু শ্রীমন্তের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি তাহার পিতার দেহের উদ্ধার নহে—তাহার আত্মার উদ্ধার। ধনপতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের

বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পুরুষত্বের দর্পে আচ্ছন্ন হইয়া, শিব ও শক্তির প্রভেদ দেখিত, কোনও মেয়েদেবতা পূজা না করিবার জন্য তাহার একটা মস্ত অহঙ্কার ছিল, এই মেয়ে দেবতা পূজার জন্য সে খুল্লনার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল; অত দুঃখ কষ্ট হইতে যে পুত্র আত্মজীবন তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সে পুত্রকেও সে কুলঘ্ন পুত্র বলিয়া তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহা দৃঢ় ভক্তির লক্ষণ সন্দেহ নাই, এবং এই দৃঢ় ভক্তি ধনপতির চরিত্রে উচ্চতা প্রদান করিয়াছে সেও সত্য, কিন্তু এ ভক্তি ভ্রান্ত ভক্তি, কারণ ইহার ভিত্তি নাই। শক্তি ও শক্ত সর্ব্বদা সম্মিলিত মূর্ত্তি দেখাইয়া ভ্রান্ত ধনপতিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে ধনপতি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া, শিবসম্মিলিত শক্তিকে প্রণাম করিয়া আত্মার উদ্ধার সাধন করিল সেই মুহূর্ত্ত তাহার জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত; শুধু তাহার জীবনের নহে শ্রীমন্তের জীবনেরও অনন্ত মুহূর্ত্ত। কবি মুকুন্দরামের ইহাই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা।

এ শিক্ষা দিবার জন্য কবি কোনও বড় বড় কথা ব্যবহার করেন নাই, কোনও মস্ত দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করেন নাই, যেমন স্বাভাবিকতার সহিত তাঁহার সকল কথাই ব্যক্ত হইয়াছে,—তাঁহার কাব্যের যাহা সাধারণ লক্ষণ,—তেমনই স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরা দ্বারাই ধনপতির চরিত্রের এই সুন্দর পরিণতি। ইহার সহিত অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার দ্বারা ধনপতির চরিত্রের ক্রমবিকাশের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

কাব্যে যাঁহারা সর্ব্বদাই বড় কথার অন্বেষণ করেন তাঁহাদের মুকুন্দ-রামের কাব্য দূরে রাখা ভাল, কারণ মুকুন্দরাম কথা সাজান না, ভাব ব্যক্ত করেন; যাঁহারা ভাবমাত্র খোঁজেন তাঁহারাও মুকুন্দরামের কাব্যে তৃপ্ত হইতে পারিবেন না; কারণ মকুন্দরাম জানিতেন যে, মনুষ্য শুধু ভাব লইয়াই জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। যাঁহারা কেবল আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহারাও মুকুন্দরামের কাব্য-পাঠে সে অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন না, কারণ মুকুন্দ কবি মনুষ্য আঁকিয়াছেন, আদর্শ গড়েন নাই। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য জীবনের চিত্র দেখিতে চাহেন, যাঁহারা মনুষ্যের ক্ষুদ্রত্ব, মহত্ব, সাধারণত্ব এ সবেরই সহিত সহানুভূতি করিতে পারেন, যাঁহারা মনুষ্যচরিত্রের সঙ্গতি চিত্রিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা মত পোষণ বা মত সমর্থন ও প্রকটন দ্বারা কাব্য পুষ্ট হয় একথা মনে না ভাবেন, যাঁহারা যথার্থ রসগ্রাহী ও রসপিপাসু, তাঁহারা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়া একাধারে কাব্য ও নাটকের রসাস্বাদন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এই পুরাতন কাব্যে কথার চাকচিক্য নাই, কিন্তু সারবত্তা আছে; ভাবের দৌরাত্ম্য নাই, অথচ ভাবের নিরাবিল প্রবাহ আছে; রসসৃষ্টির বিকট প্রয়াস নাই, কিন্তু রসের পরিপক্কতা আছে। ইহাতে দার্শনিকতার কঠোরত্ব নাই, অথচ দার্শনিকের সারতত্ত্ব আছে, স্বদেশপ্রেমিকতার বাহ্যাড়ম্বর নাই, কিন্তু স্বদেশের মনুষ্যগণের প্রতি ভালবাসা আছে; দেশের কথা আছে, দেশের আচারব্যবহার, সুখ-শান্তি দুঃখদুর্দ্দশা সকলই প্রতিবিম্বিত আছে। যদি সংযত সৌন্দর্য্যের কোন আকর্ষণ থাকে, যদি সংযমের কোন মাহাত্ম্য থাকে তো এই প্রাচীন দরিদ্র গ্রাম্য কবি আজকালকার সকল কবির উপরে স্থান পাইবার যোগ্য, ইহাই আমরা এতক্ষণ পতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই যুগের দুই কবি, দুই জনেই ক্ষমতাশালী, দুই জনেই দেশের কথা, বাঙ্গালীর কথা, ঘরের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু দুজনের বলিবার প্রথার তেমনি প্রভেদ,যেমন সূর্য্যালোকে ও চন্দ্রালোকে প্রভেদ। ভারতচন্দ্রের চরিত্র-সৃষ্টি ও মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি বিচার করিয়া আমরা সেই কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মুকুন্দরাম আসল—ভারতচন্দ্র নকল; মুকুন্দরাম সম্পূর্ণ ভারতচন্দ্র অংশ; ভারতচন্দ্র হাসি, মুকুন্দরাম মনুষ্যত্ব; ভারতচন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল, মুকুন্দরাম সংযত। তাই উপসংহারে আবার বলি, মুকুন্দরামের চণ্ডী কাব্যের মতন আর একটী কাব্য যদি বাঙ্গলায় হয় তো তাহা হইয়া কাজ নাই, একথা আমরা কখনই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের বিশ্বসংসার এই শ্যামলা শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনী শুভদা বরদা বঙ্গভূমি; তাই বলি, হে আধুনিক বঙ্গকবি! একদা বিশ্বজগৎকে হৃদয় হইতে সরাইয়া রাখিয়া এই সুফলা বঙ্গভূমির মূর্ত্তিটি দেখাও দেখি; দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ করিবার মত বঙ্গমাতার সন্তানগুলিকে একবার বাঙ্গালীর সম্মুখে দাঁড় করাও, ভাই ভাইকে দেখিয়া তৃপ্ত হউক, সন্তান মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া এই পূণ্যভূমি প্রেমে আবদ্ধ হউক। আজকালকার এত কাব্য এত সভ্যতার দিনেও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এই অমার্জ্জিত দরিদ্র গ্রাম্য কবি মুকুন্দরাম "মুকুন্দসম বাঙ্গালীর গানে"—অদ্বিতীয়, আজ এত আস্ফালনের, এত বড় কথার দিনেও কবি মুকুন্দরাম আমাদের শিক্ষার স্থল, আমাদের একমাত্র জাতীয় কবি। (তাঁহারই কাব্যে আমরা "বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল' দেখিয়া তৃপ্ত হই, তাঁহারই কাব্যে আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অতীত বার্ত্তা জানিতে পারি।) তাই আমরা মুকুন্দরামের অমর কাব্যচর্চ্চা করিয়া আধুনিক কাব্যগগনের সমুদিত রবির সহিত প্রাণ ও তান মিশাইয়া বলিতেছি—

"কে বলে তোর দরিদ্র ঘর ?
  হৃদয়ে তোর রতন রাশি ;
জানি গো তার মূল্য জানি
  পরের আদর কাড়ব না মা ।
  আমি তোমায় ছাড়ব না মা ।
মানের আশে দেশ বিদেশে,
  যে মরে সে মরুক ঘুরে ;
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা
  ভুল্‌তে সে যে পারব না মা ।"

সমাপ্ত ।